আল হুজুরাত

৪৯

নামকরণ

৪ আয়াতের اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ বাক্যাংশ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে আল হুজুরাত শব্দ আছে এটি সেই সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় এবং সূরার বিষয়বস্তু থেকেও সমর্থন পাওয়া যায় যে, এ সূরা বিভিন্ন পরিবেশ ও ক্ষেত্রে নাযিল হওয়া হুকুম–আহকাম ও নির্দেশনাসমূহের সমষ্টি। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন বর্ণনা থেকে একথাও জানা যায় যে, ঐ সব হুকুম–আহকামের বেশীর ভাগই মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। যেমন ঃ ৪ আয়াত সম্পর্কে তাফসীরকারদের বর্ণনা হচ্ছে আয়াতটি বনী তামীম গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো যার প্রতিনিধি দল এসে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের হুজরা বা গৃহের বাইরে থেকে তাঁকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিলো। সমস্ত সীরাত গ্রন্থে হিজরী ৯ম সনকে এ প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপ ৬ আয়াত সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তা ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো—রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে বনী মুস্তালিক গোত্র থেকে যাকাত আদায় করে আনতে পাঠিয়েছিলেন। একথা সবারই জানা যে, ওয়ালীদ ইবনে উকবা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে মুসলমানদেরকে এমন আদব–কায়দা, শিষ্টাচার ও আচরণ শিক্ষা দেয়া, যা তাদের ঈমানদারসুলভ স্বভাব চরিত্র ও ভাবমূর্তির উপযুক্ত ও মানানসই।

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে যেসব আদব–কায়দা ও শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ রাখতে হবে প্রথম পাঁচ আয়াতে তাদেরকে তা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রতিটি খবরই বিশ্বাস করা এবং সে অনুসারে কোন কর্মকাণ্ড করে বসা ঠিক নয়, যদি কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কওমের বিরুদ্ধে কোন খবর পাওয়া যায় তাহলে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে খবর পাওয়ার মাধ্যম নির্ভরযোগ্য কি

না। নির্ভরযোগ্য না হলে তার ভিত্তিতে কোন তৎপরতা চালানোর পূর্বে খবরটি সঠিক কি না তা যাঁচাই বাছাই করে নিতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে মুসলমানদের দু'টি দল যদি কোন সময় পরস্পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে অন্য মুসলমানদের কর্মনীতি কি হওয়া উচিত।

তারপর মুসলমানদেরকে সেসব খারাপ জিনিস থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা সমাজ জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং যার কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। একে অপরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, বদনাম ও উপহাস করা, খারাপ নামে আখ্যায়িত করা, খারাপ ধারণা পোষণ করা, অন্যের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি ও অনুসন্ধান করা, অসাক্ষাতে মানুষের বদনাম করা এগুলো এমনিতেও গোনাহের কাজ এবং সমাজে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে নাম ধরে ধরে হারাম ঘোষণা করেছেন।

অতপর গোত্রীয় ও বংশগত বৈষম্যের ওপর আঘাত হানা হয়েছে যা সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বংশের নিজ নিজ মর্যাদা নিয়ে গর্ব ও অহংকার করা, অন্যদেরকে নিজেদের চেয়ে নিম্নস্তরের মনে করা এবং নিজেদের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের হেয় করা—এসব এমন জঘন্য খাসলত যার কারণে পৃথিবী জুলুমে ভরে উঠেছে। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ছোট্ট একটি আয়াতে একথা বলে এসব অনাচারের মূলোৎপাটন করেছেন যে, "সমস্ত মানুষ একই মূল উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য, গর্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য নয় এবং একজন মানুষের ওপর আরেকজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য আর কোন বৈধ ভিত্তি নেই।"

সব শেষে মানুষকে বলা হয়েছে যে, ঈমানের মৌখিক দাবী প্রকৃত জিনিস নয়. বরং সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মানা, কার্যত অনুগত হয়ে থাকা এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর পথে জান ও মাল কুরবানী করা। সত্যিকার মু'মিন সে যে এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে। কিন্তু যারা আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া ছাড়াই শুধু মৌখিকভাবে ইসলামকে স্বীকার করে এবং তারপর এমন নীতি ও আচরণ অবলম্বন করে যেন ইসলাম গ্রহণ করে তারা কোন মহা উপকার সাধন করেছে, পৃথিবীতে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে, সমাজে তাদের সাথে মুসলমানের মত আচরণও করা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ
أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ② إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ
أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ③

হে মু'মিনগণ ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না।[১] আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[২]

হে মু'মিনগণ ! নিজেদের আওয়ায রসূলের আওয়াযের চেয়ে উঁচু করো না এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো।[৩] এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব কাজ–কর্ম ধ্বংস হয়ে যায়।[৪] যারা আল্লাহর রসূলের সামনে তাদের কন্ঠ নিচু রাখে তারাই সেসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।[৫] তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।

১. এটা ঈমানের প্রাথমিক ও মৌলিক দাবী। যে ব্যক্তি আল্লাহকে তার রব এবং আল্লাহর রসূলকে তার হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনকারী মানে সে যদি তার এ বিশ্বাসে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে সে নিজের মতামত ও ধ্যান–ধারণাকে কখনো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্তের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে পারে না, কিংবা বিভিন্ন ব্যাপারে স্বাধীন মতামত পোষণ করতে পারে না এবং ঐ সব ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূল ঐ সব ব্যাপারে কোন হিদায়াত বা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন

কিনা এবং দিয়ে থাকলে কি দিয়েছেন সে বিষয়ে আগে জানার চেষ্টা করবে। কোন মু'মিনের আচরণে এর ব্যতিক্রম কখনো হতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ বলছেন, "হে ঈমানদাররা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অগ্রগামী হয়ো না।" অর্থাৎ তাঁর আগে আগে চলবে না, পেছনে পেছনে চলো। তাঁর অনুগত হয়ে থাকো। এ বাণীতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সূরা আহযাবের ৩৬ আয়াতের নির্দেশ থেকে একটু কঠোর। সেখানে বলা হয়েছিলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে বিষয়ে ফায়সালা করে দিয়েছেন সে বিষয়ে আলাদা কোন ফায়সালা করার ইখতিয়ার কোন ঈমানদারের জন্য আর অবশিষ্ট থাকে না। আর এখানে বলা হয়েছে ঈমানদারদের নিজেদের বিভিন্ন ব্যাপারে আপনা থেকেই অগ্রগামী হয়ে ফায়সালা না করা উচিত। বরং প্রথমে দেখা উচিত ঐ সব ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাতে কি কি নির্দেশনা রয়েছে।

এ নির্দেশটি শুধু মুসলমানদের ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের সমস্ত সামাজিক ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে এটি ইসলামী আইনের মৌলিক দফা। মুসলমানদের সরকার, বিচারালয় এবং পার্লামেন্ট কোন কিছুই এ আইন থেকে মুক্ত নয়। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় সহীহ সনদে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামানের বিচারক করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিসের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ "আল্লাহর কিতাব অনুসারে।" নবী (সা) বললেন ঃ যদি কোন বিষয়ে কিতাবুল্লাহর মধ্যে হুকুম না পাওয়া যায় তাহলে কোন্ জিনিসের সাহায্য নেবে ? তিনি বললেনঃ আল্লাহর রসূলের সুন্নাতের সাহায্য নেব। তিনি বললেন ঃ যদি সেখানেও কিছু না পাও? তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি নিজে ইজতিহাদ করবো। একথা শুনে নবী (সা) তার বুকের ওপর হাত রেখে বললেন ঃ সে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি যিনি তাঁর রসূলের প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বন করার তাওফীক দান করেছেন যা তাঁর রসূলের কাছে পছন্দনীয়। নিজের ইজতিহাদের চেয়ে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং হিদায়াত লাভের জন্য সর্বপ্রথম এ দু'টি উৎসের দিকে ফিরে যাওয়াই এমন একটা জিনিস যা একজন মুসলিম বিচারক এবং একজন অমুসলিম বিচারকের মধ্যকার মূল পার্থক্য তুলে ধরে। অনুরূপ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবই যে সর্বপ্রথম উৎস এবং তারপরই যে রসূলের সুন্নাত—এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তির কিয়াস ও ইজতিহাদ তো দূরের কথা গোটা উম্মতের ইজমাও এ দু'টি উৎসের পরিপন্থী কিংবা তা থেকে স্বাধীন হতে পারে না।

২. অর্থাৎ যদি তোমরা কখনো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার নীতি গ্রহণ করো কিংবা নিজের মতামত ও ধ্যান-ধারণাকে তাঁদের নির্দেশের চেয়ে অগ্রাধিকার দান করো তাহলে জেনে রাখো তোমাদের বুঝাপড়া হবে সেই আল্লাহর সাথে যিনি তোমাদের সব কথা শুনছেন এবং মনের অভিপ্রায় পর্যন্ত অবগত আছেন।

৩. যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে ওঠাবসা ও যাতায়াত করতেন তাদেরকে এ আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিল

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ④

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤

হে নবী ! যারা তোমাকে গৃহের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করতে থাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। যদি তারা তোমার বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতো তাহলে তাদের জন্য ভাল হোত।[৬] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[৭]

নবীর (সা) সাথে দেখা–সাক্ষাত ও কথাবার্তার সময় যেন ঈমানদাররা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি একান্তভাবে লক্ষ রাখেন। কারো কন্ঠ যেন তাঁর কন্ঠ থেকে উচ্চ না হয়। তাঁকে সম্বোধন করতে গিয়ে কেউ যেন একথা ভুলে না যায় যে, সে কোন সাধারণ মানুষ বা তার সমকক্ষ কাউকে নয় বরং আল্লাহর রসূলকে সম্বোধন করে কথা বলছে। তাই সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা এবং আল্লাহর রসূলের সাথে কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য থাকতে হবে এবং কেউ তাঁর সাথে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলবে না।

যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসের জন্য এসব আদব–কায়দা শেখানো হয়েছিলো এবং নবীর (সা) যুগের লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিলো। কিন্তু যখনই নবীর (সা) আলোচনা হবে কিংবা তাঁর কোন নির্দেশ শুনানো হবে অথবা তাঁর হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হবে এরূপ সকল ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ের লোকদেরও এ আদব–কায়দাই অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া নিজের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার লোকদের সাথে কথাবার্তা ও আলাপ–আলোচনার সময় কি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এ আয়াত থেকে সে ইংগিতও পাওয়া যায়। কেউ তার বন্ধুদের সাথে কিংবা সাধারণ মানুষের সাথে যেভাবে কথাবার্তা বলে, তার কাছে সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের সাথেও যদি একইভাবে কথাবার্তা বলে তাহলে তা প্রমাণ করে যে, সে ব্যক্তির জন্য তাঁর মনে কোন সম্মানবোধ নেই এবং সে তার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।

৪. ইসলামে রসূলের ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও স্থান কি এ বাণী থেকে তা জানা যায়। কোন ব্যক্তি সম্মানলাভের যতই উপযুক্ত হোক না কেন কোন অবস্থায়ই সে এমন মর্যাদার অধিকারী নয় যে, তার সাথে বেয়াদবী আল্লাহর কাছে এমন শাস্তিযোগ্য হবে যা মূলত কুফরীর শাস্তি। বড় জোর সেটা বেয়াদবী বা অশিষ্ট আচরণ। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সামান্য শিথিলতাও এত বড় গোনাহ যে, তাতে ব্যক্তির সারা জীবনের সঞ্চিত পুঁজি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই নবীর (সা) প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই শামিল, যিনি তাঁকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে অবহেলার অর্থ স্বয়ং আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি বা অবহেলার পর্যায়ভুক্ত।

৫. অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এসব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, প্রকৃতই তাদের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখে। এ আয়াতাংশ থেকে আপনা আপনি প্রমাণিত হয়

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ⑥ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ⑦ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑧

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে শুনেই তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।[৮]

ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহর রসূল তোমাদের মাঝে বর্তমান। তিনি যদি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তোমাদের কথা মেনে নেন তাহলে তোমরা নিজেরাই অনেক সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে।[৯] *কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের কাছে পছন্দনীয় করে দিয়েছেন। আর কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে ঘৃণিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে এসব লোকই সৎপথের অনুগামী।*[১০] *আল্লাহ জ্ঞানী ও কুশলী।*[১১]

যে, যে হৃদয়ে রসূলের মর্যাদাবোধ নেই সে হৃদয়ে প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া নেই। আর রসূলের সামনে কারো কন্ঠস্বর উচ্চ হওয়া শুধু একটি বাহ্যিক অশিষ্টতাই নয় বরং অন্তরে তাকওয়া না থাকারই প্রমাণ।

৬. নবীর (সা) পবিত্র যুগে যারা তাঁর সাহচর্যে থেকে ইসলামী আদব-কায়দা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তারা সবসময় নবীর (সা) সময়ের প্রতি লক্ষ রাখতেন। তিনি আল্লাহর কাজে কতটা ব্যস্ত জীবন যাপন করেন সে ব্যাপারে তাদের পূর্ণ উপলব্ধি ছিল। এসব ক্লান্তিকর ব্যস্ততার ভেতরে কিছু সময় তাঁর আরামের জন্য, কিছু সময় অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এবং কিছু সময় পারিবারিক কাজকর্ম দেখা-শোনার জন্যও অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। এ জন্য তারা নবীর সাথে দেখা করার জন্য এমন সময় গিয়ে হাজির হতো যখন তিনি ঘরের বাইরেই অবস্থান করতেন এবং কখনো যদি তাঁকে

মজলিসে না–ও পেতো তাহলে তাঁর বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। অত্যধিক প্রয়োজন ছাড়া তাঁকে বাইরে আসার জন্য কষ্ট দিতো না। কিন্তু আরবের সে পরিবেশে যেখানে সাধারণভাবে মানুষ কোন প্রকার শিষ্টাচারের শিক্ষা পায়নি সেখানে বারবার এমন সব অশিক্ষিত লোকেরা নবীর (সা) সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে হাজির হতো যাদের ধারণা ছিল ইসলামী আন্দোলন ও মানুষকে সংশোধনের কাজ যারা করেন তাদের কোন সময় বিশ্রাম গ্রহণের অধিকার নেই এবং রাতের বেলা বা দিনের বেলা যখনই ইচ্ছা তাঁর কাছে এসে হাজির হওয়ার অধিকার তাদের আছে। আর তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, যখনই তারা আসবে তাদেরকে সাক্ষাত দানের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন। এ প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে এবং আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত লোকদের মধ্যে বিশেষভাবে এমন কিছু অজ্ঞ অভদ্র লোকও থাকতো যারা নবীর (সা) সাথে সাক্ষাত করতে আসলে কোন খাদেমের মাধ্যমে ভিতরে খবর দেয়ার কষ্টটাও করতো না। নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের হুজরার চারদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে বাইরে থেকেই তাঁকে ডাকতে থাকতো। সাহাবীগণ হাদীসে এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। লোকজনের এ আচরণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব কষ্ট হতো। কিন্তু স্বভাবগত ধৈর্যের কারণে তিনি এসব সহ্য করে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন এবং এ অশিষ্ট কর্মনীতির জন্য তিরস্কার করে লোকজনকে এ নির্দেশনা দান করলেন যে, যখন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে তাঁকে পাবে না, তখন চিৎকার করে তাঁকে ডাকার পরিবর্তে ধৈর্যের সাথে বসে সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যখন তিনি নিজেই তাদেরকে সাক্ষাতদানের জন্য বেরিয়ে আসবেন।

৭. অর্থাৎ এ যাবত যা হওয়ার তা হয়েছে। যদি ভবিষ্যতে এ ভুলের পুনরাবৃত্তি না করা হয় তবে আল্লাহ অতীতের সব ভুল ক্ষমা করে দেবেন এবং যারা তাঁর রসূলকে এভাবে কষ্ট দিয়েছে দয়া ও করুণা পরবশ হয়ে তিনি তাদের পাকড়াও করবেন না।

৮. অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এ আয়াতটি ওয়ালীদ ইবনে উকবা ইবনে আবী মু'আইত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এর পটভূমি হচ্ছে, বনী মুসতালিক গোত্র মুসলমান হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে যাকাত আদায় করে আনার জন্য ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে পাঠালেন। সে তাদের এলাকায় পৌঁছে কোন কারণে ভয় পেয়ে গেল এবং গোত্রের লোকদের কাছে না গিয়েই মদীনায় ফিরে গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বলে অভিযোগ করলো যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। এ খবর শুনে নবী (সা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের শায়েস্তা করার জন্য একদল সেনা পাঠাতে মনস্থ করলেন। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেনাদল পাঠিয়েছিলেন এবং কোন কোনটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মোট কথা, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, এ সময়ে বনী মুসতালিক গোত্রের নেতা হারেস ইবনে দ্বেরার (উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরিয়ার পিতা) এক প্রতিনিধি দল নিয়ে নবীর (সা) খেদমতে হাজির হন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম যাকাত দিতে অস্বীকৃতি এবং ওয়ালীদকে হত্যা করার চেষ্টা তো দূরের কথা তার সাথে আমাদের সাক্ষাত পর্যন্ত হয়নি। আমরা ঈমানের ওপরে অবিচল আছি এবং যাকাত প্রদানে আদৌ অনিচ্ছুক নই। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত

নাযিল হয়। এ ঘটনাটি ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী এবং ইবনে জারীর সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হারেস ইবনে দ্বেরার, মুজাহিদ, কাতাদা, আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা, ইয়াযীদ ইবনে রূমান, দ্বাহ্হাক এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান থেকে উদ্বৃত করেছেন। হযরত উম্মে সালামা বর্ণিত হাদীসে পুরো ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে সুস্পষ্টভাবে ওয়ালীদের নামের উল্লেখ নেই।

এ নাজুক পরিস্থিতিতে যখন একটি ভিত্তিহীন খবরের ওপর নির্ভর করার কারণে একটি বড় ভুল সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো সে মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এ মৌলিক নির্দেশটি জানিয়ে দিলেন যে, যখন তোমরা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর পাবে যার ভিত্তিতে বড় রকমের কোন ঘটনা সংঘটিত হতে পারে তখন তা বিশ্বাস করার পূর্বে খবরের বাহক কেমন ব্যক্তি তা যাঁচাই করে দেখো। সে যদি কোন ফাসেক লোক হয় অর্থাৎ যার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই প্রতীয়মান হয় যে, তার কথা নির্ভরযোগ্য নয় তাহলে তার দেয়া খবর অনুসারে কাজ করার পূর্বে প্রকৃত ঘটনা কি তা অনুসন্ধান করে দেখো। আল্লাহর এ হুকুম থেকে শরীয়াতের একটি নীতি পাওয়া যায় যার প্রয়োগ ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। এ নীতি অনুসারে যার চরিত্র ও কাজ–কর্ম নির্ভরযোগ্য নয় এমন কোন সংবাদদাতার সংবাদের ওপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা জাতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়। এ নীতির ভিত্তিতে হাদীস বিশারদগণ হাদীস শাস্ত্রে "জারহ্ ও তা'দীল"–এর নীতি উদ্ভাবন করেছেন। যাতে যাদের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসমূহ পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছেছিলো তাদের অবস্থা যাঁচাই বাছাই করতে পারেন। তাছাড়া সাক্ষ আইনের ক্ষেত্রে ফকীহগণ নীতি নির্ধারণ করেছন যে, এমন কোন ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে না যার দ্বারা শরীয়াতের কোন নির্দেশ প্রমাণিত হয় কিংবা কোন মানুষের ওপর কোন অধিকার বর্তায়। তবে এ ব্যাপারে পণ্ডিতগণ একমত যে, সাধারণ পার্থিব ব্যাপারে প্রতিটি খবরই যাঁচাই ও অনুসন্ধান করা এবং খবরদাতার নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরী নয়। কারণ, আয়াতে نَبَأٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি সব রকম খবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, শুধু গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণে ফকীহগণ বলেন, সাধারণ ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে এ নীতি খাটে না। উদাহরণ স্বরূপ আপনি কারো কাছে গেলেন এবং বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। বাড়ীর ভেতর থেকে কেউ এসে বললো, আসুন। এ ক্ষেত্রে আপনি তার কথার ওপর নির্ভর করে প্রবেশ করতে পারেন। বাড়ীর মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতির সংবাদদাতা সৎ না অসৎ এ ক্ষেত্রে তা দেখার প্রয়োজন নেই। অনুরূপ ফকীহগণ এ ব্যাপারেও একমত, যেসব লোকের ফাসেকী মিথ্যাচার ও চারিত্রিক অসততার পর্যায়ের নয়, বরং আকীদা–বিকৃতির কারণে ফাসেক বলে আখ্যায়িত তাদের সাক্ষ এবং বর্ণনাও গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু আকীদা খারাপ হওয়া তাদের সাক্ষ ও বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক নয়।

৯. বনী মুসতালিক গোত্র সম্পর্কে ওয়ালীদ ইবনে উকবার খবরের ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যে তাদের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ পরিচালনার জন্য

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑨ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ⑩

ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়[১২] তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।[১৩] তারপরও যদি দু'টি দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তবে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো।[১৪] যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।[১৫] এরপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের সাথে মীমাংসা করিয়ে দাও[১৬] এবং ইনসাফ করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।[১৭] মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও।[১৮] আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে।

পীড়াপীড়ি করছিলো আয়াতের পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকেও এ বিষয়ে ইংগিত পাওয়া যায় এবং কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সিরও আয়াতটি থেকে তাই বুঝেছেন। এ কারণে ঐ সব লোককে তিরস্কার করে বলা হয়েছে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তোমাদের মধ্যে বর্তমান, একথা ভুলে যেয়ো না। তিনি তোমাদের জন্য কল্যাণের বিষয়কে তোমাদের চেয়ে অধিক জানেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত তোমাদের কাছে যথোপযুক্ত মনে হয় তিনি যেন সে অনুসারেই কাজ করেন তোমাদের এরূপ আশা করাটা অত্যন্ত অন্যায় দুঃসাহস। যদি তোমাদের কথা অনুসারে সব কাজ করা হতে থাকে তাহলে বহু ক্ষেত্রে এমন সব ভুল-ত্রুটি হবে যার ভোগান্তি তোমাদেরকেই পোহাতে হবে।

১০. অর্থাৎ কতিপয় লোক তাদের অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিচালনা করতে চাচ্ছিলো। তাদের এ চিন্তা ছিল ভুল। তবে মু'মিনদের গোটা জামায়াত এ ভুল করেনি। মু'মিনদের সঠিক পথের ওপর কায়েম থাকার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর দয়া ও মেহেরবানীতে ঈমানী আচার-আচরণকে তাদের জন্য প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন এবং কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর আচরণকে তাদের কাছে ঘৃণিত করে দিয়েছেন। এ আয়াতের দু'টি অংশে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে। لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ আয়াতাংশে সব

সাহাবীকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়নি, বরং যারা বনী মুসতালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য পীড়াপীড়ি করছিলো সে বিশেষ কিছু সাহাবীকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। আর وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ আয়াতাংশে সমস্ত সাহাবীদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করার দুঃসাহস কখনো দেখাতেন না। বরং ঈমানের দাবী অনুসারে তাঁর হিদায়াত ও দিকনির্দেশনার ওপর নির্ভর করে সবসময় আনুগত্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। এর দ্বারা আবার একথা বুঝায় না যে, যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলো তাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি কোন ভালবাসা ছিল না। একথা থেকে যে বিষয়ের ইংগিত পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঈমানের এ দাবীর ব্যাপারে তাদের মধ্যে শিথিলতা এসে পড়েছিলো। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলো। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথমে এ ভুল ও এর কুফল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং পরে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সাহাবীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে নীতির অনুসারী সেটিই সঠিক নীতি ও আচরণ।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী কোন অযৌক্তিক ভাগ-বাঁটোয়ারা নয়। তিনি যাকেই এ বিরাট নিয়ামত দান করেন জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে দান করেন এবং নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে যাকে এর উপযুক্ত বলে জানেন তাকেই দান করেন।

১২. আল্লাহ একথা বলেননি, যখন ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি গোষ্ঠী পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয় বরং বলেছেন, "যদি ঈমানদারদের দু'টি দল একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।" একথা থেকে স্বতঃই বুঝা যায় যে, পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া মুসলমানদের নীতি ও স্বভাব নয় এবং হওয়া উচিতও নয়। মু'মিন হয়েও তারা পরস্পর লড়াই করবে এটা তাদের কাছ থেকে আশাও করা যায় না। তবে কখনো যদি এরূপ ঘটে তাহলে সে ক্ষেত্রে এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত যা পরে বর্ণনা করা হচ্ছে। তাছাড়া দল বুঝাতেও فرقة শব্দ ব্যবহার না করে طائفة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় فرقة বড় দলকে এবং طائفة ছোট দলকে বুঝায়। এ থেকেও ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে এটি একটা চরম অপছন্দনীয় ব্যাপার। মুসলমানদের বড় বড় দলের এতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকাও উচিত নয়।

১৩. এ নির্দেশ দ্বারা এমন সমস্ত মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা উক্ত বিবদমান দল দু'টিতে শামিল নয় এবং যাদের পক্ষে যুদ্ধমান দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা করে দেয়া সম্ভব। অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পর লড়াই করতে থাকবে আর মুসলমান নিষ্ক্রিয় বসে তামাশা দেখবে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সেটা মুসলমানের কাজ নয়। বরং এ ধরনের দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে তাতে সমস্ত ঈমানদার লোকদের অস্থির হয়ে পড়া উচিত এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণে যার পক্ষে যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব তাকে তা করতে হবে। উভয় পক্ষকে লড়াই থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে হবে। তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাতে হবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ উভয় পক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত

করবে। বিবাদের কারণসমূহ জানবে এবং নিজ নিজ সাধ্যমত তাদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার সব রকম প্রচেষ্টা চালাবে।

১৪.. অর্থাৎ এটাও মুসলমানের কাজ নয় যে, সে অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেবে এবং যার প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে কিংবা অত্যাচারীকে সহযোগিতা করবে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, যুদ্ধরত দু' পক্ষের মধ্যে সন্ধি করানোর সমস্ত প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে দেখতে হবে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী কে এবং অত্যাচারী কে? যে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী তাকে সহযোগিতা করবে। আর যে অত্যাচারী তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। যেহেতু এ লড়াই করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন তাই তা ওয়াজিব এবং জিহাদ হিসেবে গণ্য। এটা সেই ফিতনার অন্তরভুক্ত নয় যার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ القائم فيها خير من الماشى والقاعد فيها خير من القائم (সে ফিতনার সময় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলতে থাকা ব্যক্তির চেয়ে এবং বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম।) কারণ, সে ফিতনার দ্বারা মুসলমানদের নিজেদের মধ্যকার সে লড়াইকে বুঝানো হয়েছে যা উভয় পক্ষের মাঝে গোত্র প্রীতি, জাহেলী সংকীর্ণতা এবং পার্থিব স্বার্থ অর্জনের প্রতিযোগিতা থেকে সংঘটিত হয় এবং দু' পক্ষের কেউই ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। তবে অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের সহযোগিতার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তা ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা নয়। বরং আল্লাহর আদেশ মান্য করা। এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সমস্ত ফিকাহবিদগণ একমত এবং ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কোন মতানৈক্য ছিল না। (আহকামুল কুরআন—জাসসাস) এমনকি কিছু সংখ্যক ফকীহ একে জিহাদের চাইতেও উত্তম বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের যুক্তি হলো, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গোটা খিলাফতকাল কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পরিবর্তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটিয়ে দিয়েছেন। (রুহুল মাআনী)। এ ধরনের লড়াই ওয়াজিব নয় বলে কেউ যদি তার সপক্ষে এই বলে যুক্তি পেশ করে যে, হযরত আলীর (রা) এসব যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং আরো কতিপয় সাহাবী অংশ গ্রহণ করেননি তাহলে সে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে। ইবনে উমর নিজেই বলেছেন ঃ

ما وجدت فى نفسى من شيئ ما وجدت من هذه الاية انى لم اقاتل هذه الفئة الباغية كما امرنى الله تعالى - (المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة ، باب الدفع عمن قعدوا عن بيعة على)

"কোন বিষয়ে আমার মনে এতটা খটকা লাগেনি যতটা এ আয়াতের কারণে লেগেছে। কেননা, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আমি ঐ বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।"

সীমালংঘনকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ এটাই নয় যে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করতেই হবে এবং তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে তার

বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা এবং এর মূল উদ্দেশ্য তার অত্যাচার নিরসন করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ধরনের শক্তি প্রয়োগ অনিবার্য তা ব্যবহার করতে হবে এবং যতটা শক্তি প্রয়োগ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে যথেষ্ট তার চেয়ে কম শক্তিও প্রয়োগ করবে না আবার বেশীও প্রয়োগ করবে না। এ নির্দেশে সেই লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা শক্তি প্রয়োগ করে অত্যাচার ও সীমালংঘন নিরসন করতে সক্ষম।

১৫. এ থেকে বুঝা যায়, এ যুদ্ধ বিদ্রোহী (সীমালংঘনকারী দল)–কে বিদ্রোহের (সীমালংঘনের) শাস্তি দেয়ার জন্য নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য। আল্লাহর নির্দেশ অর্থ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত অনুসারে যা ন্যায় বিদ্রোহী দল তা মেনে নিতে উদ্যোগী হবে এবং সত্যের এ মানদণ্ড অনুসারে যে কর্মপন্থাটি সীমালংঘন বলে সাব্যস্ত হবে তা পরিত্যাগ করবে। কোন বিদ্রোহী দল যখনই এ নির্দেশ অনুসরণ করতে সম্মত হবে তখন থেকেই তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। কারণ, এটিই এ যুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ ও উদ্দেশ্য। এরপরও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে তাহলে সে–ই সীমালংঘনকারী। এখন কথা হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাত অনুসারে কোন বিবাদে ন্যায় কি এবং অন্যায় কি তা নির্ধারণ করা নিসন্দেহে তাদেরই কাজ যারা এ উম্মতের মধ্যে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির দিক দিয়ে বিষয়টি বিচার–বিশ্লেষণ করার যোগ্য।

১৬. শুধু সন্ধি করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সন্ধি করিয়ে দেয়ার। এ থেকে বুঝা যায় হক ও বাতিলের পার্থক্যকে উপেক্ষা করে শুধু যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যে সন্ধি করানো হয় এবং যেখানে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী দলকে অবদমিত করে সীমালংঘনকারী দলকে অন্যায়ভাবে সুবিধা প্রদান করানো হয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তার কোন মূল্য নেই। সে সন্ধিই সঠিক যা ন্যায় বিচারের ওপর ভিত্তিশীল। এ ধরনের সন্ধি দ্বারা বিপর্যয় দূরীভূত হয়। তা না হলে ন্যায়ের অনুসারীদের অবদমিত করা এবং সীমালংঘনকারীদের সাহস ও উৎসাহ যোগানোর অনিবার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, অকল্যাণের মূল কারণসমূহ যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়। এমনকি তা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা থেকে বার বার বিপর্যয় সৃষ্টির ঘটনা ঘটতে থাকে।

১৭. এ আয়াতটি মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে শরয়ী বিধানের মূল ভিত্তি। একটি মাত্র হাদীস (যা আমরা পরে বর্ণনা করব) ছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে এ বিধানের আর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ, নবীর (সা) যুগে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের মত কোন ঘটনাই কখনো সংঘটিত হয়নি যে, তাঁর কাজ ও কথা থেকে এ বিধানের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। পরে হযরত আলীর (রা) খিলাফত যুগে যখন মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ হয় তখন এ বিধানের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ দেয়া হয়। তখন যেহেতু বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম বর্তমান ছিলেন তাই তাদের কর্মকাণ্ড ও বর্ণিত আদেশ থেকে ইসলামী বিধানের এ শাখার বিস্তারিত নিয়ম–কানুন বিধিবদ্ধ করা হয়। বিশেষ করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নীতি ও কর্মপন্থা এ ব্যাপারে সমস্ত ফিকাহবিদদের কাছে মূল উৎস হিসেবে গণ্য হয়। নিচে আমরা এ বিধানের একটি প্রয়োজনীয় সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করছি ঃ

এক ঃ মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধের কয়েকটি ধরন হতে পারে এবং প্রতিটি ধরন সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান বিভিন্ন ঃ

(ক) যুদ্ধরত দু'টি দল যখন কোন মুসলিম সরকারের প্রজা হবে তখন তাদের সন্ধি ও সমঝোতা করে দেয়া কিংবা তাদের মধ্যে কোন্ দলটি সীমালংঘনকারী তা নির্ণয় করা এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে ন্যায় ও সত্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(খ) যুদ্ধরত দু'পক্ষই যখন দু'টি বড় শক্তিশালী দল হবে কিংবা দু'টি মুসলিম সরকার হবে এবং উভয়ে পার্থিব স্বার্থের জন্য লড়াই চালাবে তখন মু'মিনদের কাজ হলো এ ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা থেকে চূড়ান্তভাবে বিরত থাকা এবং উভয় পক্ষকেই আল্লাহর ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে থাকা।

(গ) যুদ্ধরত যে দু'টি পক্ষের কথা ওপরে (খ) অংশে উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি পক্ষ যদি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আর অপর পক্ষ যদি বাড়াবাড়ি করতে থাকে এবং আপোষ মীমাংসায় রাজী না হয় সে ক্ষেত্রে ঈমানদারদের কর্তব্য হচ্ছে সীমালংঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে ন্যায়পন্থী দলের পক্ষ অবলম্বন করা।

(ঘ) উভয় পক্ষের একটি পক্ষ যদি প্রজা হয় আর তারা সরকার অর্থাৎ মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকে তাহলে ফিকাহবিদগণ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী এ দলকেই তাদের পরিভাষায় বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

দুই ঃ বিদ্রোহী অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী গোষ্ঠীও নানা রকম হতে পারে ঃ

(ক) যারা শুধু হাংগামা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়েছে। এ বিদ্রোহের স্বপক্ষে তাদের কাছে কোন শরীয়াতসম্মত কারণ নেই। এ ধরনের দল ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরকারের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সর্বসম্মত মতে বৈধ এবং এ ক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন করা ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সরকার ন্যায়বান হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না।

(খ) যেসব বিদ্রোহী সরকারকে উৎখাতের জন্য বিদ্রোহ করে। কিন্তু এ জন্য তাদের কাছে শরীয়াত সম্মত কোন যুক্তি নেই। বরং তাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তারা জালেম ও ফাসিক। এ ক্ষেত্রে সরকার যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয় তাহলে তাকে সমর্থন করা বিনা বাক্য ব্যয়ে ওয়াজিব। কিন্তু সে সরকার যদি ন্যায়নিষ্ঠ নাও হয় তবুও তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করা ওয়াজিব। কারণ সেই সরকারের জন্যই রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা টিকে আছে।

(গ) যারা নতুন কোন শরয়ী ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা বাতিল এবং আকীদা ফাসেদ; যেমন, খারেজীদের আকীদা ও ব্যাখ্যা। এরূপ ক্ষেত্রে মুসলিম সরকারের তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বৈধ অধিকার আছে। সে সরকার ন্যায়নিষ্ঠ হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না। আর এ সরকারকে সমর্থন করাও ওয়াজিব।

(ঘ) যারা এমন কোন ন্যায়নিষ্ঠ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যার প্রধানের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব বৈধভাবে কায়েম হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের কাছে শরীয়াতসম্মত কোন

ব্যাখ্যা থাক বা না থাক সরকারের সর্বাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বৈধ এবং তাদের সমর্থন করা ওয়াজিব।

(৬) যারা এমন একটি জালেম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে যার নেতৃত্ব জোর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যার নেতৃবৃন্দ ফাসেক। কিন্তু বিদ্রোহকারীগণ ন্যায়নিষ্ঠ। তারা আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকেও প্রতিভাত হচ্ছে যে, তারা সৎ ও নেক্কার। এরূপ ক্ষেত্রে তাদেরকে 'বিদ্রোহী' অর্থাৎ সীমালংঘনকারী বলে আখ্যায়িত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করার ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে চরম মতবিরোধ হয়েছে। এ মতবিরোধের বিষয়টি আমরা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

অধিকাংশ ফিকাহবিদ এবং আহলে হাদীসদের মত হচ্ছে, যে নেতার নেতৃত্ব একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁর ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রে শান্তি, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় আছে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ও অত্যাচারী যাই হয়ে থাকুন না কেন এবং তাঁর নেতৃত্ব যেভাবেই কায়েম হয়ে থাকুক না কেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। তবে তিনি সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলে তা ভিন্ন কথা। ইমাম সারাখসী লিখছেন ঃ মুসলমানগণ যখন কোন শাসকের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে এবং তার কারণে শান্তি লাভ করে ও পথঘাট নিরাপদ হয় এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কোন দল বা গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে যার যুদ্ধ করার ক্ষমতা আছে এমন লোকদের মুসলমানদের ঐ শাসকের সাথে মিলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। (আল মাবসূত, খাওয়ারেজ অধ্যায়) ইমাম নববী শরহে মুসলিমে বলেন ঃ নেতা অর্থাৎ মুসলিম শাসকবৃন্দ জালেম এবং ফাসেক হলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও লড়াই করা হারাম। এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে ইমাম নববী দাবী করেছেন।

কিন্তু এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে দাবী করা ঠিক নয়। মুসলিম ফিকাহ্‌বিদদের একটি বড় দল যার মধ্যে বড় বড় জ্ঞানী ও পণ্ডিত অন্তরভুক্ত বিদ্রোহকারীদের কেবল তখনই বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন যখন তারা ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জালেম ও ফাসেক নেতাদের বিরুদ্ধে সৎ ও নেক্কার লোকদের অবাধ্যতাকে তারা কুরআন মজীদের পরিভাষা অনুসারে বিদ্রোহের নামান্তর বলে আখ্যায়িত করেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ওয়াজিব বলেও মনে করেন না। অত্যাচারী নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার মতামত বিষয়ে জ্ঞানীগণ সম্যক অবহিত। আবু বকর জাস্‌সাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, ইমাম সাহেব এ যুদ্ধকে শুধু জায়েযই মনে করতেন না বরং অনুকূল পরিস্থিতিতে ওয়াজিব বলে মনে করতেন। (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯) বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যায়েদ ইবনে আলীর বিদ্রোহে তিনি যে শুধু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাই নয়, বরং অন্যদেরকেও তা করতে উপদেশ দিয়েছেন। (আল জাস্‌সাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১)। মনসূরের বিরুদ্ধে নাফসে যাকিয়ার বিদ্রোহে তিনি পুরাপুরি সক্রিয়ভাবে নাফসে যাকিয়াকে সাহায্য করেছেন। সেই যুদ্ধকে তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়েও উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। (আল জাস্‌সাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১; মানাকেবে আবী হানীফা, আল কারদারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা

৭১-৭২) তাছাড়াও ইমাম সারাখসী যে সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন তা হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের সর্বসম্মত মত নয়। হিদায়ার শরাহ ফাতহুল কাদীরে ইবনে হুমাম লিখছেন ঃ

الباغى فى عرف الفقهاء الخارج عن طاعة امام الحق

"সাধারণভাবে ফিকাহবিদদের মতে বিদ্রোহী সে-ই যে ন্যায় পরায়ণ ইমামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়।"

হাম্বলীদের ইবনে আকীল ও ইবনুল জুযী ন্যায়নিষ্ঠ নয় এমন ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে জায়েয বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে তারা হযরত হুসাইনের বিদ্রোহকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। (আল ইনসাফ, ১০ খণ্ড, বাবু কিতালি আহলিল বাগী) ইমাম শাফেয়ী তাঁর কিতাবুল উম্ম গ্রন্থে সে ব্যক্তিকে বিদ্রোহী বলে মত প্রকাশ করেছেন, যে ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫) মুদাওয়ানা গ্রন্থে ইমাম মালেকের মত উদ্বৃত হয়েছে যে, বিদ্রাহী যদি ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে। (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭) কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআনে তাঁর এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন, যদি কেউ উমর ইবনে আবদুল আযীযের মত ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে তাকে দমন করা ওয়াজিব। তাঁর চেয়ে ভিন্নতর কোন ইমাম সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় তাকে ঐ অবস্থাই ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা অপর কোন জালেম দ্বারা তাকে শাস্তি দেবেন এবং তৃতীয় কোন জালেম দ্বারা তাদের উভয়কে আবার শাস্তি দেবেন। তিনি ইমাম মালেকের আরো একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তা হচ্ছে এক শাসকের কাছে আনুগত্যের শপথ নিয়ে থাকলে তার ভাইও যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার বিরুদ্ধেও লড়াই করা হবে যদি সে ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হয়। আমাদের সময়ের ইমাম বা নেতাদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তাদের কোন বাইয়াত বা আনুগত্য শপথই নেই। কারণ জবরদস্তিমূলকভাবে তাদের পক্ষে শপথ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া সাহনূনের বরাত দিয়ে কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী উলামাদের যে রায় বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, যুদ্ধ কেবল ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের সহযোগিতার জন্যই করা যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম বাইয়াতকৃত ইমাম ন্যায়নিষ্ঠ হোক কিংবা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ব্যক্তি ন্যায়নিষ্ঠ হোক তাতে কিছু এসে যায় না। দু' জনের কেউই যদি ন্যায়নিষ্ঠ না হয় তাহলে দু'জনের থেকেই দূরে থাকো। তবে যদি তোমার নিজের জীবনের ওপর হামলা হয় কিংবা মুসলমানগণ জুলুমের শিকার হয় তাহলে প্রতিরোধ করো। এ মত উদ্ধৃত করার পর কাজী আবু বকর বলেন ঃ

لانقاتل الامع امام عادل يقدمه اهل الحق لانفسهم

"সত্যের অনুসারীগণ যাকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাকে ছাড়া আর কারো জন্য আমরা যুদ্ধ করবো না।"

তিন ঃ বিদ্রোহীরা যদি স্বল্প সংখ্যক হয়, কোন বড় দল তাদের পৃষ্ঠপোষক না থাকে এবং তাদের কাছে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম বেশী না থাকে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ সম্পর্কিত আইন প্রযোজ্য হবে না। তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ আইন প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ

তারা যদি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে তাহলে কিসাস গহণ করা হবে এবং আর্থিক ক্ষতি সাধন করে থাকলে জরিমানা অদায় করা হবে। যেসব বিদ্রোহী কোন বড় রকমের শক্তির অধিকারী এবং অধিকতর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বিপুল যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে বিদ্রোহ করবে বিদ্রোহ বিষয়ক আইন কানুন কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

চার ঃ বিদ্রোহীরা যতক্ষণ শুধু তাদের ভ্রান্ত আকীদা–বিশ্বাস অথবা সরকার ও সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহাত্মক ও শত্রুতামূলক ধ্যান–ধারণা প্রকাশ করতে থাকবে ততক্ষণ তাদেরকে হত্যা বা বন্দী করা যাবে না। যখন তারা কার্যত সশস্ত্র বিদ্রোহ করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে কেবল তখনই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। (আল মাবসূত—বাবুল খাওয়ারিজ, ফাতহুল কাদীর—বাবুল বুগাত, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)।

পাঁচ ঃ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে ইনসাফ ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করার আহবান জানানো হবে। তাদের যদি কোন সন্দেহ–সংশয় এবং প্রশ্ন থাকে তাহলে যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দূর করার চেষ্টা করা হবে। তা সত্ত্বেও যদি তারা বিরত না হয় এবং তাদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধ শুরু করা হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হবে। (ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)।

ছয় ঃ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বরাত দিয়ে হাকেম, বায্‌যার ও আল জাস্‌সাস বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নীতিমালার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে উম্মে আবদের পুত্র, এ উম্মতের বিদ্রোহীদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ কি তা কি জান?" তিনি বললেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন ঃ তাদের আহতদের ওপর আঘাত করা হবে না, বন্দীদের হত্যা করা হবে না, পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করা হবে না এবং তাদের সম্পদ গনীমতের সম্পদ হিসেবে বন্টন করা হবে না। এ নীতিমালার দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি ও কর্ম সমস্ত ফিকাহ্‌বিদ এ উক্তি ও আমলের ওপর নির্ভর করেছেন। উষ্ট্র যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করলেন ঃ পলায়নপরদের পিছু ধাওয়া করো না, আহতদের আক্রমণ করো না, বন্দীদের হত্যা করো না, যে অস্ত্র সমর্পণ করবে তাকে নিরাপত্তা দান করো, মানুষের বাড়ীঘরে প্রবেশ করো না এবং গালি দিতে থাকলেও কোন নারীর ওপর হাত তুলবে না। হযরত আলীর সেনাদলের কেউ কেউ দাবী করলো যে, বিরোধী ও তাদের সন্তান–সন্ততিদের দাস বানিয়ে বন্টন করে দেয়া হোক। হযরত আলী (রা) একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশাকে তার নিজের অংশে নিতে চাও?

সাত ঃ হযরত আলীর (রা) অনুসৃত নীতি ও আদর্শ থেকে বিদ্রোহীদের অর্থ–সম্পদ সম্পর্কে যে বিধান গৃহীত হয়েছে তা হচ্ছে, তাদের সম্পদ সেনাবাহিনীর মধ্যে পাওয়া যাক কিংবা বাড়ীতে থাক এবং সম্পদের মালিক জীবিত হোক বা মৃত হোক কোন অবস্থায়ই তা গনীমতের মাল হিসেবে গণ্য করা যাবে না এবং সৈন্যদের মধ্যে বন্টনও করা যাবে না। তবে যে মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া জরুরী নয়। যুদ্ধ

শেষ হলে এবং বিদ্রোহ স্তিমিত হওয়ার পর তাদের সম্পদ তাদেরকেই ফেরত দেয়া হবে। যুদ্ধ চলাকালে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন যদি হস্তগত হয় তা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ওগুলোকে বিজয়ীদের মালিকানাভুক্ত করে গনীমতের সম্পদ হিসেবে বন্টন করা হবে না এবং পুনরায় তাদের বিদ্রোহ করার আশংকা না থাকলে ঐ সব জিনিসও তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। শুধু ইমাম আবু ইউসুফের মত হচ্ছে, সরকার ঐ সব সম্পদ গনীমত হিসেবে গণ্য করবেন। (আল মাবসূত, ফাতহুল কাদীর, আল জাস্‌সাস)।

আট ঃ পুনরায় বিদ্রোহ করবে না এ প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে দেয়া হবে। (আল মাবসূত)

নয় ঃ নিহত বিদ্রোহীদের মাথা কেটে প্রদর্শন করা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। কারণ তা মৃতদেহ বিকৃতকরণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এক রোমান বিশপের মাথা কেটে হযরত আবু বকরের (রা) কাছে আনা হলে তিনি তাতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন ঃ রোমান ও ইরানীদের অন্ধ অনুসরণ আমাদের কাজ নয়। সুতরাং কাফেরদের সাথে যেখানে এরূপ আচরণ করা গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে মুসলমানদের সাথে এরূপ আচরণ আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। (আল মাবসূত)

দশ ঃ যুদ্ধকালে বিদ্রোহীদের যেসব প্রাণ ও সম্পদের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে যুদ্ধ শেষ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার কোন কিসাস বা ক্ষতিপূরণ তাদের ওপর বর্তাবে না। ফিতনা ও অশান্তি পুনরায় যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্য কোন নিহতের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না কিংবা কোন সম্পদের জন্য তাদের জরিমানাও করা যাবে না। সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক লড়াইয়ে এ নীতিমালাই অনুসরণ করা হয়েছিলো। (আল মাবসূত, আল জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)

এগার ঃ যেসব অঞ্চল বিদ্রোহীদের করতলগত হয়েছে এবং সেখানে তারা নিজেদের প্রশাসন চালু করে যাকাত এবং সরকারী কর ইত্যাদি আদায় করে নিয়েছে, সরকার ঐ সব অঞ্চল পুনর্দখলের পর জনগণের কাছে পুনরায় উক্ত যাকাত ও কর দাবী করবে না। বিদ্রোহীরা যদি উক্ত অর্থ শরীয়াতসম্মত পন্থায় খরচ করে থাকে তাহলে আদায়কারীদের পক্ষ থেকে তা আল্লাহর কাছেও আদায়কৃত বলে গণ্য হবে। কিন্তু তারা যদি উক্ত সম্পদ শরীয়াতসম্মত নয় এমন পন্থায় খরচ করে থাকে তাহলে তা প্রদানকারী এবং আল্লাহর মধ্যকার ব্যাপার। তারা চাইলে পুনরায় যাকাত আদায় করতে পারে। (ফাতহুল কাদীর, আল জাস্‌সাস—ইবনুল আরাবী)।

বার ঃ বিদ্রোহীরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলে যেসব বিচারালয় কায়েম করেছিল তার বিচারক যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে থাকেন এবং শরীয়াত অনুসারে বিচারকার্য সমাধা করে থাকেন তাহলে তাদের নিয়োগকারীরা বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হলেও তা বহাল রাখা হবে। কিন্তু তাদের ফায়সালা যদি শরীয়াতসম্মত না হয় এবং বিদ্রোহ দমনের পর তাদেরকে সরকারের বিচারালয়ে বিচারের জন্য হাজির করা হয় তাহলে তাদের ফায়সালাসমূহ বহাল রাখা হবে না। তাছাড়া বিদ্রোহীদের প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়সমূহের পক্ষ থেকে জারী করা ওয়ারেন্ট বা হুকুমনামা সরকারের আদালতে গৃহীত হবে না। (আল মাবসূত, আল জাস্‌সাস)

তের ঃ ইসলামী আদালতসমূহে বিদ্রোহীদের সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ ন্যায় ও ইনসাফের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফাসেকীর অন্তরভুক্ত। ইমাম মুহাম্মাদ বলেন ঃ যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ করবে এবং ন্যায়ের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহে লিপ্ত হবে ততক্ষণ তাদের সাক্ষ গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু একবার তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লে আমি আর তাদের সাক্ষ গ্রহণ করবো না। (আল জাস্‌সাস)

এসব বিধান থেকে মুসলমান বিদ্রোহী এবং কাফের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আইনে পার্থক্য কি তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

১৮. এ আয়াতটি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শ বা মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে এমন কোন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন পাওয়া যায় না যা মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়। এটাও এ আয়াতের বরকতে সাধিত হয়েছে। এ নির্দেশের দাবী ও গুরুত্বসমূহ কি, বহুসংখ্যক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করেছেন। ঐ সব হাদীসের আলোকে এ আয়াতের আসল লক্ষ ও উদ্দেশ্য বোধগম্য হতে পারে।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে তিনটি বিষয়ে "বাইয়াত" নিয়েছেন। এক, নামায কায়েম করবো। দুই, যাকাত আদায় করতে থাকবো। তিন, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো। (বুখারী—কিতাবুল ঈমান)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী। (বুখারী—কিতাবুল ঈমান) মুসনাদে আহমাদে হযরত সাঈদ ইবনে মালেক ও তার পিতা থেকে অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।" (মুসলিম—কিতাবুল বির্‌র ওয়াসসিলাহ, তিরমিযী—আবওয়াবুল বিরর ওয়াস্‌সিলাহ)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী নবীর (সা) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ঈমানদারদের সাথে একজন ঈমানদারের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখ–কষ্ট ঠিক অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে। (মুসনাদে আহমাদ) অপর একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মু'মিনগণ একটি দেহের মত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

২ রুকূ'

হে[১৯] ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম।[২০] তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপ করোনা[২১] এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না।[২২] ঈমান গ্রহণের পর গোনাহর কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার।[২৩] যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালেম।

দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

আরো একটি হাদীসে নবীর (সা) এ বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, মু'মিনগণ পরস্পরের জন্য একই প্রাচীরের ইঁটের মত একে অপরের থেকে শক্তিলাভ করে থাকে। (বুখারী—কিতাবুল আদাব, তিরমিযী—কিতাবুল বিরূর–ওয়াস্ সিলাহ)

১৯. পূর্বের দু'টি আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই সম্পর্কে জরুরী নির্দেশনা দেয়ার পর ঈমানদারদেরকে এ অনুভূতি দেয়া হয়েছিল যে, ইসলামের পবিত্রতম সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা একে অপরের ভাই এবং আল্লাহর ভয়েই তাদেরকে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করা উচিত। এখন পরবর্তী দু'টি আয়াতে এমন সব বড় বড় অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যা সাধারণত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। একে অপরের ইজ্জতের ওপর হামলা, একে অপরকে মনোকষ্ট দেয়া, একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা এবং একে অপরের দোষ–ত্রুটি তালাশ করা পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির এগুলোই মূল কারণ। এসব কারণ অন্যান্য কারণের সাথে মিশে বড় বড় ফিতনার সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তার যেসব ব্যাখ্যা হাদীসসমূহে পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে মানহানি (Law of Libel) সম্পর্কিত বিস্তারিত আইন–বিধান রচনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের মানহানি সম্পর্কিত আইন এ ক্ষেত্রে এতটাই অসম্পূর্ণ যে, এ আইনের অধীনে কেউ মানহানির অভিযোগ পেশ করে নিজের মর্যাদা আরো কিছু খুইয়ে আসে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন প্রত্যেক ব্যক্তির এমন একটি মৌলিক মর্যাদার স্বীকৃতি দেয় যার ওপর কোন আক্রমণ

চালানোর অধিকার কারো নেই। এ ক্ষেত্রে হামলা বাস্তবতা ভিত্তিক হোক বা না হোক এবং যার ওপর আক্রমণ করা হয়, জনসমক্ষে তার কোন সুপরিচিত মর্যাদা থাক বা না থাক তাতে কিছু যায় আসে না। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে অপমান করেছে শুধু এতটুকু বিষয়ই তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। তবে এ অপমান করার যদি কোন শরীয়াতসম্মত বৈধতা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

২০. বিদ্রূপ করার অর্থ কেবল কথার দ্বারা হাসি-তামাসা করাই নয়। বরং কারো কোন কাজের অভিনয় করা, তাঁর প্রতি ইংগিত করা, তার কথা, কাজ, চেহারা বা পোশাক নিয়ে হাসাহাসি করা অথবা তার কোন ত্রুটি বা দোষের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে অন্যদের হাসি পায়। এ সবই হাসি-তামাসার অন্তরভূক্ত। মূল নিষিদ্ধ বিষয় হলো কেউ যেন কোনভাবেই কাউকে উপহাস ও হাসি-তামাসার লক্ষ না বানায়। কারণ, এ ধরনের হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পেছনে নিশ্চিতভাবে নিজের বড়ত্ব প্রদর্শন এবং অপরকে অপমানিত করা ও হেয় করে দেখানোর মনোবৃত্তি কার্যকর। যা নৈতিকভাবে অত্যন্ত দোষণীয়। তাছাড়া এভাবে অন্যের মনোকষ্ট হয় যার কারণে সমাজে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ কারণেই এ কাজকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

পুরুষ ও নারীদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, পুরুষদের নারীদেরকে বিদ্রূপের লক্ষ বানানো এবং নারীদের পুরুষদেরকে হাসি-তামাসার লক্ষ বানানো জায়েয। মূলত যে কারণে নারী ও পুরুষদের বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, ইসলাম এমন সমাজ আদৌ সমর্থন করে না। যেখানে নারী পুরুষ অবাধে মেলামেশা করতে পারে। অবাধ খোলামেলা মজলিসেই সাধারণত একজন আরেকজনকে হাসি-তামাসার লক্ষ বানাতে পারে। মুহাররাম নয় এমন নারী পুরুষ কোন মজলিসে একত্র হয়ে পরস্পর হাসি-তামাসা করবে ইসলামে এমন অবকাশ আদৌ রাখা হয়নি। তাই একটি মুসলিম সমাজের একটি মজলিসে পুরুষ কোন নারীকে উপহাস ও বিদ্রূপ করবে কিংবা নারী কোন পুরুষকে বিদ্রূপ ও উপহাস করবে এমন বিষয় কল্পনার যোগ্যও মনে করা হয়নি।

২১. মূল আয়াতে لمز শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির মধ্যে বিদ্রূপ ও কুৎসা ছাড়াও আরো কিছু সংখ্যক অর্থ এর মধ্যে শামিল। যেমন ঃ উপহাস করা, অপবাদ আরোপ করা, দোষ বের করা এবং খোলাখুলি বা গোপনে অথবা ইশারা-ইংগিত করে কাউকে তিরস্কারের লক্ষস্থল বানানো। এসব কাজও যেহেতু পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট করে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাই এসব কাজও হারাম করে দেয়া হয়েছে। এখানে আল্লাহর ভাষার চমৎকারিত্ব এই যে, لَا يَلْمِزْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (একে অপরকে বিদ্রূপ করো না) বলার পরিবর্তে لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ (নিজেকে নিজে বিদ্রূপ করো না) কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা স্বতই একথার ইংগিত পাওয়া যায় যে, অন্যদের বিদ্রূপ ও উপহাসকারী প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই বিদ্রূপ ও উপহাস করে। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যতক্ষণ না কারো মনে কুপ্রেরণার লাভা জমে উপচে পড়ার জন্য প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ তার মুখ অন্যদের কুৎসা রটনার জন্য খুলবে না। এভাবে এ মানসিকতার লালনকারী অন্যদের আগে নিজেকেই তো কুকর্মের আস্তানা বানিয়ে ফেলে। তারপর যখন সে অন্যদের ওপর আঘাত করে তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে তার নিজের ওপর আঘাত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ⑫

হে ঈমানদারগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান গোনাহ।[২৪] দোষ অন্বেষণ করো না।[২৫] আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে।[২৬] এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?[২৭] দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।

করার জন্য অন্যদেরকে আহবান করছে। ভদ্রতার কারণে কেউ যদি তার আক্রমণ এড়িয়ে চলে তাহলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু যাকে সে তার বাক্যবাণের লক্ষস্থল বানিয়েছে সে–ও পাল্টা তার ওপর আক্রমণ করুক এ দরজা সে নিজেই খুলে দিয়েছে।

২২. এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে এমন নামে যেন ডাকা না হয় অথবা এমন উপাধি না দেয়া হয় যা তার অপছন্দ এবং যা দ্বারা তার অবমাননা ও অমর্যাদা হয়। যেমন কাউকে ফাসেক বা মুনাফিক বলা। কাউকে খোঁড়া, অন্ধ অথবা কানা বলা। কাউকে তার নিজের কিংবা মা–বাপের অথবা বংশের কোন দোষ বা ত্রুটির সাথে সম্পর্কিত করে উপাধি দেয়া। মুসলমান হওয়ার পর তার পূর্ব অনুসৃত ধর্মের কারণে ইহুদী বা খৃষ্টান বলা। কোন ব্যক্তি, বংশ, আত্মীয়তা অথবা গোষ্ঠীর এমন নাম দেয়া যার মধ্যে তার নিন্দা ও অপমানের দিকটি বিদ্যমান। তবে যেসব উপাধি বাহ্যত খারাপ কিন্তু তা দ্বারা কারো নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং ঐ উপাধি দ্বারা যাদের সম্বোধন করা হয় তা তাদের পরিচয়ের সহায়ক এমন সব উপাধি এ নির্দেশের মধ্যে পড়ে না। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ "আসমাউর রিজাল" (বা হাদীসের রাবীদের পরিচয় মূলক) শাস্ত্রে সুলায়মান আল আ'মাশ (ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন সুলায়মান) এবং ওয়াসেল আল আহদাব (কুঁজো ওয়াসেল) এর মত নামের উল্লেখ রেখেছেন। যদি একই নামের কয়েকজন লোক থাকে এবং তাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার বিশেষ কোন উপাধি দ্বারাই কেবল চেনা যায় তাহলে ঐ উপাধি খারাপ হলেও তা বলা যেতে পারে। যেমন আবদুল্লাহ নামের যদি কয়েকজন লোক থাকে আর তাদের মধ্যে একজন অন্ধ হয় তাহলে তাকে চেনার সুবিধার জন্য আপনি 'অন্ধ আবদুল্লাহ' বলতে পারেন। অনুরূপ এমন সব উপাধি বা উপনাম এ নির্দেশের মধ্যে পড়বে না যা দ্বারা বাহ্যত অমর্যাদা বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভালবাসা ও স্নেহবশতই রাখা হয় এবং যাদেরকে এ উপাধি বা উপনামে ডাকা হয় তারা নিজেরাও তা পছন্দ করে। যেমন ঃ আবু হুরাইরা এবং আবু তুরাব।

২৩. ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও সে কটুভাষী হবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজের জন্য বিখ্যাত হবে এটা একজন ঈমানদারের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। কোন কাফের যদি মানুষকে ঠাট্টা–বিদ্রূপ ও উপহাস করা কিংবা বেছে বেছে বিদ্রূপাত্মক নাম দেয়ার ব্যাপারে খুব খ্যাতি লাভ করে তাহলে তা মনুষ্যত্বের বিচারে যদিও সুখ্যাতি নয় তবুও অন্তত তার কুফরীর বিচারে তা মানায়। কিন্তু কেউ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাতে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যদি এরূপ হীন বিশেষণে ভূষিত হয় তাহলে তার জন্য পানিতে ডুবে মরার শামিল।

২৪. একেবারেই ধারণা করতে নিষেধ করা হয়নি। বরং খুব বেশী ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে এবং সব রকম ধারণার অনুসরণ থেকে মানা করা হয়েছে। এর কারণ বলা হয়েছে এই যে, অনেক ধারণা গোনাহর পর্যায়ে পড়ে। এ নির্দেশটি বুঝার জন্য আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত ধারণা কত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের নৈতিক অবস্থা কি?

এক প্রকারের ধারণা হচ্ছে, যা নৈতিকতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং দীনের দৃষ্টিতেও কাম্য ও প্রশংসিত। যেমন ঃ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং ঈমানদারদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করা। তাছাড়া যাদের সাথে ব্যক্তির মেলামেশা ও উঠাবসা আছে এবং যাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণের কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

আরেক প্রকার ধারণা আছে যা বাদ দিয়ে বাস্তব জীবনে চলার কোন উপায় নেই। যেমন, আদালতে বিচারকের সামনে যেসব সাক্ষ পেশ করা হয় তা যাঁচাই বাছাই করে নিশ্চিত প্রায় ধারণার ভিত্তিতে ফায়সালা করা ছাড়া আদালত চলতে পারে না। কারণ, বিচারকের পক্ষে ঘটনা সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। আর সাক্ষের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নিশ্চিত সত্য হয় না, বরং প্রায় নিশ্চিত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ক্ষেত্রে কোন না কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে, কিন্তু বাস্তব জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না সে ক্ষেত্রে ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া মানুষের জন্য আর কোন উপায় থাকে না।

তৃতীয় এক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলত খারাপ ধারণা হলেও বৈধ প্রকৃতির। এ প্রকারের ধারণা গোনাহের অন্তরভুক্ত হতে পারে না। যেমন ঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চরিত্র ও কাজ–কর্মে কিংবা তার দৈনন্দিন আচার–আচরণ ও চালচলনে এমন সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে ওঠে যার ভিত্তিতে সে আর ভাল ধারণার যোগ্য থাকে না। বরং তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণের একাধিক যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান। এরূপ পরিস্থিতিতে শরীয়াত কখনো এ দাবী করে না যে, সরলতা দেখিয়ে মানুষ তার প্রতি অবশ্যই ভাল ধারণা পোষণ করবে। তবে এ বৈধ খারাপ ধারণা পোষণের চূড়ান্ত সীমা হচ্ছে তার সম্ভাব্য দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিছক ধারণার ভিত্তিতে আরো অগ্রসর হয়ে তার বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালানো ঠিক নয়।

চতুর্থ আরেক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলত গোনাহ, সেটি হচ্ছে, বিনা কারণে কারো অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কিংবা অন্যদের ব্যাপারে মতস্থির করার বেলায় সবসময় খারাপ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই শুরু করা কিংবা এমন লোকদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা যাদের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সৎ ও শিষ্ট হওয়ার প্রমাণ দেয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি কোন কথা বা কাজে যদি ভাল ও মন্দের সমান

সম্ভাবনা থাকে কিন্তু খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যদি তা খারাপ হিসেবেই ধরে নেই তাহলে তা গোনাহের কাজ বলে গণ্য হবে। যেমন ঃ কোন সৎ ও ভদ্র লোক কোন মাহফিল থেকে উঠে যাওয়ার সময় নিজের জুতার পরিবর্তে অন্য কারো জুতা উঠিয়ে নেন আমরা যদি ধরে নেই যে, জুতা চুরি করার উদ্দেশ্যেই তিনি এ কাজ করেছেন। অথচ এ কাজটি ভুল করেও হতে পারে। কিন্তু ভাল সম্ভাবনার দিকটি বাদ দিয়ে খারাপ সম্ভাবনার দিকটি গ্রহণ করার কারণ খারাপ ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ বিশ্লেষণ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ধারণা করা কোন নিষিদ্ধ বিষয় নয়। বরং কোন কোন পরিস্থিতিতে তা পছন্দনীয়, কোন কোন পরিস্থিতিতে অপরিহার্য, কোন কোন পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জায়েয কিন্তু ঐ সীমার বাইরে নাজায়েয এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে একেবারেই নাজায়েয। তাই একথা বলা হয়নি যে, ধারণা বা খারাপ ধারণা করা থেকে একদম বিরত থাকো। বরং বলা হয়েছে, অধিকমাত্রায় ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। তাছাড়া নির্দেশটির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করার জন্য আরো বলা হয়েছে, কোন কোন ধারণা গোনাহ। এ সতর্কীকরণ দ্বারা আপনা থেকেই বুঝা যায় যে, যখনই কোন ব্যক্তি ধারণার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে কিংবা কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তখন তার ভালভাবে যাচাই বাছাই করে দেখা দরকার, যে ধারণা সে পোষণ করছে তা গোনাহর অন্তরভুক্ত নয় তো? আসলেই কি এরূপ ধারণা পোষণের দরকার আছে? এরূপ ধারণা পোষণের জন্য তার কাছে যুক্তিসংগত কারণ আছে কি? সে ধারণার ভিত্তিতে সে যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করছে তা কি বৈধ? যেসব ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এতটুকু সাবধানতা তারা অবশ্যই অবলম্বন করবে। লাগামহীন ধারণা পোষণ কেবল তাদেরই কাজ যারা আল্লাহর ভয় থেকে মুক্ত এবং আখেরাতের জবাবদিহি সম্পর্কে উদাসীন।

২৫. অর্থাৎ মানুষের গোপন বিষয় তালাশ করো না। একজন আরেকজনের দোষ খুঁজে বেড়িও না। অন্যদের অবস্থা ও ব্যাপার স্যাপার অনুসন্ধান করে বেড়াবে না। খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে এ আচরণ করা হোক কিংবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য করা হোক অথবা শুধু নিজের কৌতুহল ও ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য করা হোক শরীয়াতের দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। অন্যদের যেসব বিষয় লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে তা খোঁজাখুজি করা এবং কার কি দোষ-ত্রুটি আছে ও কার কি কি দুর্বলতা গোপন আছে পর্দার অন্তরালে উঁকি দিয়ে তা জানার চেষ্টা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়। মানুষের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, দু'জনের কথোপকথন কান পেতে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরে উঁকি দেয়া এবং বিভিন্ন পন্থায় অন্যদের পারিবারিক জীবন কিংবা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি খোঁজ করে বেড়ানো একটা বড় অনৈতিক কাজ। এর দ্বারা নানা রকম ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ কারণে একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খোতবায় দোষ অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته (ابو داؤد)

"হে সেই সব লোকজন, যারা মুখে ঈমান এনেছো কিন্তু এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় খুঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়াবে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটির অন্বেষণে লেগে যাবেন। আর আল্লাহ যার ত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার ঘরের মধ্যে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।" (আবু দাউদ)

হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন ঃ আমি নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم

"তুমি যদি মানুষের গোপনীয় বিষয় জানার জন্য পেছনে লাগো। তাদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করবে কিংবা অন্তত বিপর্যয়ের দ্বার প্রান্তে পৌছে দেবে।" (আবু দাউদ)

অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اذا ظننتم فلا تحققوا (احكام القران - للجصاص)

"তোমাদের মনে কারো সম্পর্কে সন্দেহ হলে, অন্বেষণ করো না।"

(আহকামুল কুরআন -জাস্‌সাস)

অপর একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

من رأى عورة فسترها كان كمن احيا موؤدة (الجصاص)

"কেউ যদি কারো গোপন দোষ-ত্রুটি দেখে ফেলে এবং তা গোপন রাখে তাহলে সে যেন একজন জীবন্ত পুঁতে ফেলা মেয়ে সন্তানকে জীবন দান করলো।" (আল জাস্‌সাস)

দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করার এ নির্দেশ শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, বরং ইসলামী সরকারের জন্যেও। ইসলামী শরীয়াত নাহী আনিল মুনকারের (মন্দ কাজের প্রতিরোধ) যে দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছে তার দাবী এ নয় যে, সে একটি গোয়েন্দা চক্র কায়েম করে মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটিসমূহ খুঁজে খুঁজে বের করবে এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবে। বরং যেসব অসৎ প্রবণতা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়বে কেবল তার বিরুদ্ধেই তার শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। গোপনীয় দোষ-ত্রুটি ও খারাপ চালচলন সংশোধনের উপায় গোয়েন্দাগিরি নয়। বরং শিক্ষা, ওয়াজ-নসীহত, জনসাধারণের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ এবং একটি পবিত্র সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করাই তার একমাত্র উপায়। এ ক্ষেত্রে হযরত উমরের (রা) এ ঘটনা অতীব শিক্ষাপ্রদ। একবার রাতের বেলা তিনি এক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে গান গাইতেছিল। তাঁর সন্দেহ হলো। তিনি প্রাচীরে উঠে দেখলেন, সেখানে শরাব প্রস্তুত, তার সাথে এক নারীও। তিনি চিৎকার করে বললেন ঃ ওরে আল্লাহর দুশমন, তুই কি মনে করেছিস যে, তুই আল্লাহর নাফরমানী করবি আর তিনি তোর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করবেন না? জবাবে সে বললো ঃ আমীরুল মু'মেনীন, তাড়াহুড়ো করবেন না। আমি যদি একটি গোনাহ করে থাকি তবে আপনি তিনটি গোনাহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আপনি দোষ-ত্রুটি খুঁজেছেন। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো। কিন্তু আপনি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন,

নিজের ঘর ছাড়া অনুমতি না নিয়ে অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়াই আপনি আমার ঘরে পদার্পণ করেছেন।" এ জবাব শুনে হযরত উমর (রা) নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন না। তবে তিনি তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে কল্যাণ ও সুকৃতির পথ অনুসরণ করবে। (মাকারিমুল আখলাক—আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর আল খারায়েতী) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুঁজে খুঁজে মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটি বের করা এবং তারপর তাদেরকে পাকড়াও করা শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যও জায়েয নয়। একটি হাদীসেও একথা উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

ان الامير اذا بتغى الريبة فى الناس افسدهم (ابو داؤد)

"শাসকরা যখন সন্দেহের বশে মানুষের দোষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে তখন তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়।" (আবু দাউদ)

তবে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি খোঁজ-খবর নেয়া ও অনুসন্ধান করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তবে সেটা এ নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়। যেমন ঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচার-আচরণে বিদ্রোহের কিছুটা লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে তারা কোন অপরাধ সংঘটিত করতে যাচ্ছে বলে আশংকা সৃষ্টি হলে সরকার তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে পারে। অথবা কোন ব্যক্তিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় বা তার সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে চায় তাহলে তার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য সে তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে ও খোঁজ-খবর নিতে পারে।

২৬. গীবতের সংজ্ঞা হচ্ছে, "কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কারো এমন কথা বলা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে।" খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গীবতের এ সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং আরো অনেক হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঐ হাদীসে নবী (সা) গীবতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে ঃ

ذكرك اخاك بما يكره - قيل افرأيت ان كان فى اخى ما اقول ؟

قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته -

"গীবত হচ্ছে, তুমি এমনভাবে তোমার ভাইয়ের কথা বললে যা তার কাছে অপছন্দনীয়। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে তাহলে আপনার মত কি? তিনি বললেন ঃ তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি না থাকে তাহলে অপবাদ আরোপ করলে।"

ইমাম মালেক (র) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এ বিষয়ে আর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

ان رجلا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة ؟ فقال

ان تذكر من المرء ما يكره ان يسمع - فقال يارسول الله وان كان حقا ؟ قال اذا قلت باطلا فذلك البهتان -

"এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, গীবত কাকে বলে ? তিনি বললেন : কারো সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা তার পছন্দ নয়। সে বললো : হে আল্লাহর রসূল, যদি আমার কথা সত্য হয়? তিনি জবাব দিলেন : তোমার কথা মিথ্যা হলে তো সেটা অপবাদ।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারো বিরুদ্ধে তার অনুপস্থিতিতে মিথ্যা অভিযোগ করাই অপবাদ। আর তার সত্যিকার দোষ–ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত। এ কাজ স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে করা হোক বা ইশারা ইংগিতের মাধ্যমে করা হোক সর্বাবস্থায় হারাম। অনুরূপভাবে এ কাজ ব্যক্তির জীবদ্দশায় করা হোক বা মৃত্যুর পরে করা হোক উভয় অবস্থায় তা সমানভাবে হারাম। আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মায়েয ইবনে মালেক আসলামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপরাধে 'রজম' করার শাস্তি কার্যকর করার পর নবী (সা) পথে চলতে চলতে শুনলেন এক ব্যক্তি তার সংগীকে বলছে : এ লোকটার ব্যাপারটাই দেখো, আল্লাহ তার অপরাধ আড়াল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না তাকে কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি তার পিছু ছাড়েনি। সামনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটি গাধার গলিত মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হলো। নবী (সা) সেখানে থেমে গেলেন এবং ঐ দু' ব্যক্তিকে ডেকে বললেন : "তোমরা দু'জন ওখানে গিয়ে গাধার ঐ গলিত মৃত দেহটা আহার করো।" তারা দু'জনে বললো : হে আল্লাহর রসূল, কেউ কি তা খেতে পারে? নবী (সা) বললেন :

فما قلتما من عرض اخيكما انفا اشد من اكل منه

"তোমরা এইমাত্র তোমাদের ভাইয়ের সম্মান ও মর্যাদার ওপর যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলে তা গাধার এ মৃতদেহ খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী নোংরা কাজ।"

যেসব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বা তার মৃত্যুর পর তার মন্দ দিকগুলো বর্ণনা করার এমন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে সঠিক এবং গীবত ছাড়া ঐ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না, আর ঐ প্রয়োজন পূরণের জন্য গীবত না করা হলে তার চেয়েও অধিক মন্দ কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়ে এমন ক্ষেত্রসমূহ গীবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশের অন্তরভুক্ত নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যতিক্রমকে মূলনীতি হিসেবে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

ان من اربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق

(ابو داؤد)

"কোন মুসলমানের মান–মর্যাদার ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা জঘন্যতম জুলুম।"

এ বাণীতে "অন্যায়ভাবে" কথাটি বলে শর্তযুক্ত করাতে বুঝা যায় যে, ন্যায়ভাবে এরূপ করা জায়েয। নবীর (সা) নিজের কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমন কয়েকটি নজীর দেখতে পাই যা

থেকে জানা যায় ন্যায়ভাবে বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং কি রকম পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে গীবত করা জায়েয হতে পারে।

একবার এক বেদুঈন এসে নবীর (সা) পিছনে নামাযে শামিল হলো এবং নামায শেষ হওয়া মাত্রই একথা বলে প্রস্থান করলো যে, হে আল্লাহ! আমার ওপর রহম করো এবং মুহাম্মাদের ওপর রহম করো। আমাদের দু'জন ছাড়া আর কাউকে এ রহমতের মধ্যে শরীক করো না। নবী (সা) সাহাবীদের বললেন ঃ

اتقولون هو اضل ام بعيره ؟ الم تسمعوا الى ما قال

"তোমরা কি বলো, এ লোকটাই বেশী বেকুফ, না তার উট? তোমরা কি শুননি সে কি বলছিলো?" (আবু দাউদ)

নবীকে (সা) তার অনুপস্থিতিতেই একথা বলতে হয়েছে। কারণ সালাম ফেরানো মাত্রই সে চলে গিয়েছিল। নবীর উপস্থিতিতেই সে একটি ভুল কথা বলে ফেলেছিল। তাই এ ব্যাপারে তাঁর নিশ্চুপ থাকা কাউকে এ ভ্রান্তিতে ফেলতে পারতো যে, সময় বিশেষে এরূপ কথা বলা হয় তো জায়েয। তাই নবী (সা) কর্তৃক একথার প্রতিবাদ করা জরুরী হয়ে পড়েছিলো।

ফাতেমা বিনতে কায়েস নামক এক মহিলাকে দু' ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব দেন। একজন হযরত মুয়াবিয়া (রা) অপরজন আবুল জাহম (রা)। ফাতেমা বিনতে কায়েস নবীর (সা) কাছে এসে পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন ঃ মুয়াবিয়া গরীব আর আবুল জাহম স্ত্রীদের বেদম প্রহার করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম) এখানে একজন নারীর ভবিষ্যত জীবনের প্রশ্ন জড়িত ছিল। সে নবীর (সা) কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছিল। এমতাবস্থায় উভয় ব্যক্তির যে দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি তাঁর জানা ছিল তা তাকে জানিয়ে দেয়া তিনি জরুরী মনে করলেন।

একদিন নবী (সা) হযরত আয়েশার (রা) ঘরে ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি তার গোত্রের অত্যন্ত খারাপ লোক। এরপর তিনি বাইরে গেলেন এবং তার সাথে অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে কথাবার্তা বললেন। নবী (সা) ঘরে ফিরে আসলে হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ আপনি তো তার সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা বললেন। অথচ যাওয়ার সময় আপনি তার সম্পর্কে ঐ কথা বলেছিলেন। জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ

ان شر الناس منزلة عندَ اللّٰه يوم القيامة من ودعه (وتركه) النّاسُ اتقاء فحشه -

"যে ব্যক্তির কটু বাক্যের ভয়ে লোকজন তার সাথে উঠাবসা পরিত্যাগ করে কিয়ামতের দিন সে হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে জঘন্যতম ব্যক্তি।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ ঘটনা সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও নবী (সা) তার সাথে সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলেছেন এ জন্য যে, নবীর (সা) উত্তম স্বভাব এটিই দাবী করে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি আশংকা করলেন ঃ

লোকটির সাথে তাঁকে দয়া ও সৌজন্য প্রকাশ করতে দেখে তার পরিবারের লোকজন তাকে তাঁর বন্ধু বলে মনে করে বসতে পারে। তাহলে পরে কোন সময় সে এর সুযোগ নিয়ে কোন অবৈধ সুবিধা অর্জন করতে পারে। তাই তিনি হযরত আয়েশাকে সতর্ক করে দিলেন যে, সে তার গোত্রের জঘন্যতম মানুষ।

এক সময় হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা এসে নবীকে (সা) বললো, "আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এমন অর্থকড়ি সে দেয় না।" (বুখারী ও মুসলিম) স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর এ ধরনের অভিযোগ যদিও গীবতের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু নবী (সা) তা বৈধ করে দিয়েছেন। কারণ জুলুমের প্রতিকার করতে পারে এমন ব্যক্তির কাছে জুলুমের অভিযোগ নিয়ে যাওয়ার অধিকার মজলুমের আছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের এসব দৃষ্টান্তের আলোকে ফকীহ ও হাদীস বিশারদগণ এ বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, গীবত কেবল তখনই বৈধ যখন একটি সংগত (অর্থাৎ শরীয়াতের দৃষ্টিতে সংগত) কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার প্রয়োজন পড়ে এবং ঐ প্রয়োজন গীবত ছাড়া পূরণ হতে পারে না। সুতরাং এ বিধির ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ নিম্নরূপ গীবতকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন ঃ

এক ঃ যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিকারের জন্য কিছু করতে পারে বলে আশা করা যায় এমন ব্যক্তির কাছে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের ফরিয়াদ।

দুই ঃ সংশোধনের উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তিদের কাছে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্মের কথা বলা যারা তার প্রতিকার করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

তিন ঃ ফতোয়া চাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন মুফতির কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার সময় যদি কোন ব্যক্তির ভ্রান্ত কাজ-কর্মের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়।

চার ঃ মানুষকে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অপকর্মের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধান করে দেয়া। যেমন ঃ হাদীস বর্ণনাকারী, সাক্ষী এবং গ্রন্থ প্রণেতাদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করা সর্বসম্মত মতে শুধু জায়েযই নয়, বরং ওয়াজিব। কেননা, এ ছাড়া শরীয়াতকে ভুল রেওয়ায়াতের প্রচারণা ও বিস্তার থেকে, আদালতসমূহকে বেইনসাফী থেকে এবং জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। অথবা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী কিংবা কারো বাড়ীর পাশে বাড়ী খরিদ করতে চায় অথবা কারো সাথে অংশীদারী কারবার করতে চায় অথবা কারো কাছে আমানত রাখতে চায় সে আপনার কাছে পরামর্শ চাইলে তাকে সে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবহিত করা আপনার জন্য ওয়াজিব যাতে না জানার কারণে সে প্রতারিত না হয়।

পাঁচ ঃ যেসব লোক গোনাহ ও পাপকার্যের বিস্তার ঘটাচ্ছে অথবা বিদআত ও গোমরাহীর প্রচার চালাচ্ছে অথবা আল্লাহর বান্দাদেরকে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড ও জুলুম- নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সোচ্চার হওয়া এবং তাদের দুষ্কর্ম ও অপকীর্তির সমালোচনা করা।

ছয় ঃ যেসব লোক কোন মন্দ নাম বা উপাধিতে এতই বিখ্যাত হয়েছে যে, ঐ নাম ও উপাধি ছাড়া অন্য কোন নাম বা উপাধি দ্বারা তাদেরকে আর চেনা যায় না, তাদের মর্যাদা হানির উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরিচয়দানের জন্য ঐ নাম ও উপাধি ব্যবহার করা।

(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ফাতহুল বারী, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬২; শরহে মুসলিম—নববী, বাব ঃ তাহরীমুল গীবাত। রিয়াদুস সালেহীন, বাব ঃ মা ইউবাহ মিনাল গীবাত। আহ্‌কামুল কুরআন—জাস্‌সাস। রূহুল মা'আনী—লা ইয়াগতাব বাদুকুম বাদান–আয়াতের তাফসীর)।

এ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলো ছাড়া অসাক্ষাতে কারো নিন্দাবাদ একেবারেই হারাম। এ নিন্দাবাদ সত্য ও বাস্তব ভিত্তিক হলে তা গীবত, মিথ্যা হলে অপবাদ এবং দু'জনের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হলে চোখলখুরী। ইসলামী শরীয়াত এ তিনটি জিনিসকেই হারাম করে দিয়েছে। ইসলামী সমাজে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে যদি তার সামনে অন্য কোন ব্যক্তির ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হতে থাকে তাহলে সে যেন চুপ করে তা না শোনে বরং তার প্রতিবাদ করে। আর যদি কোন বৈধ শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কারো সত্যিকার দোষ–ত্রুটিও বর্ণনা করা হতে থাকে তাহলে এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে এবং এ গোনাহ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিতে হবে।

নবী (সা) বলেছেন ঃ

ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الاخذله اللّٰه تعالى فى مواطن يحب فيها نصرته - وما من امرئ ينصر امرأ مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره اللّٰه عزوجل فى مواطن يحب فيها نصرته - (ابو داؤد)

"যদি কোন ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোন মুসলমানকে সাহায্য না করে যেখানে তাকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে এবং তার মান–ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে সেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন না যেখানে সে তাঁর সাহায্যের প্রত্যাশা করে। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোন মুসলমানকে সাহায্য করে যখন তার মান–ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করা হচ্ছে তাহলে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে এমন পরিস্থিতিতে সাহায্য করবেন যখন সে আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী হবে।" (আবু দাউদ)।

গীবতকারী ব্যক্তি যখনই উপলব্ধি করবে যে, সে এ গোনাহ করছে অথবা করে ফেলেছে তখন তার প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। এরপর তার ওপর দ্বিতীয় যে কর্তব্য বর্তায় তা হচ্ছে, যতদূর সম্ভব এ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী।[২৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।।[২৯]

গোনাহের ক্ষতিপূরণ করা। সে যদি কোন মৃত ব্যক্তির গীবত করে থাকে তাহলে সে ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য অধিক মাত্রায় দোয়া করবে। যদি কোন জীবিত ব্যক্তির গীবত করে থাকে এবং তা অসত্যও হয় তাহলে যাদের সাক্ষাতে সে এ অপবাদ আরোপ করেছিল তাদের সাক্ষাতেই তা প্রত্যাহার করবে। আর যদি সত্য ও বাস্তব বিষয়ে গীবত করে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো তার নিন্দাবাদ করবে না। তাছাড়া যার নিন্দাবাদ করেছিল তার কাছে মাফ চেয়ে নেবে। একদল আলেমের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকে, কেবল তখনই ক্ষমা চাওয়া উচিত। অন্যথায় শুধু তাওবা করলেই চলবে। কারণ, যে ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত না থাকে এবং গীবতকারী তার কাছে গিয়ে বলে, আমি তোমার গীবত করেছিলাম তাহলে তা তার জন্য মনোকষ্টের কারণ হবে।

২৭. এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে এ কাজের চরম ঘৃণিত হওয়ার ধারণা দিয়েছেন। মৃতের গোশত খাওয়া এমনিতেই ঘৃণ্য ব্যাপার। সে গোশতও যখন অন্য কোন জন্তুর না হয়ে মানুষের হয়, আর সে মানুষটিও নিজের আপন ভাই হয় তাহলে তো কোন কথাই নেই। তারপর এ উপমাকে প্রশ্নের আকারে পেশ করে আরো অধিক কার্যকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে নিজেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, সে কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে প্রস্তুত আছে? সে যদি তা খেতে রাজি না হয় এবং তার প্রবৃত্তি এতে ঘৃণাবোধ করে তাহলে সে কিভাবে এ কাজ পছন্দ করতে পারে যে, সে তার কোন মু'মিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মান মর্যাদার ওপর হামলা চালাবে যেখানে সে তা প্রতিরোধ করতে পারে না, এমনকি সে জানেও না যে, তাকে বেইজ্জতি করা হচ্ছে। এ আয়াতাংশ থেকে একথাও জানা গেল যে, গীবত হারাম হওয়ার মূল কারণ যার গীবত করা হয়েছে তার মনোকষ্ট নয়। বরং কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার নিন্দাবাদ করা আদতেই হারাম, চাই সে এ সম্পর্কে অবহিত হোক বা না হোক কিংবা এ কাজ দ্বারা সে কষ্ট পেয়ে থাক বা না থাক। সবারই জানা কথা, মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া এ জন্য হারাম নয় যে, তাতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। মৃত্যুর পর কে তার লাশ ছিঁড়ে খাবলে খাচ্ছে তা মৃতের জানার কথা নয়। কিন্তু সেটা আদতেই অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। অনুরূপ, যার গীবত

করা হয়েছে, কোনভাবে যদি তার কাছে খবর না পৌঁছে তাহলে কোথায় কোন্ ব্যক্তি কখন কাদের সামনে তার মান–ইজ্জতের ওপর হামলা করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ কার কার দৃষ্টিতে সে নীচ ও হীন সাব্যস্ত হয়েছিল, তা সে সারা জীবনেও জানতে পারবে না। না জানার কারণে এ গীবত দ্বারা সে আদৌ কোন কষ্ট পাবে না। কিন্তু এতে অবশ্যই তার মর্যাদাহানি হবে। তাই ধরন ও প্রকৃতির দিক থেকে কাজটি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

২৮. মুসলিম সমাজকে বিভিন্ন অকল্যাণ ও অনাচার থেকে রক্ষা করার জন্য যেসব পথনির্দেশের প্রয়োজন ছিল পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের উদ্দেশ করে সেসব পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছিলো। এখন এ আয়াতে গোটা মানব জাতিকে উদ্দেশ করে একটি বিরাট গোমরাহীর সংশোধন করা হচ্ছে যা আবহমান কাল ধরে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

অর্থাৎ বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ এবং জাতীয়তার গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা। প্রাচীনতম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মানুষ সাধারণত মানবতাকে উপক্ষো করে তাদের চারপাশে কিছু ছোট ছোট বৃত্ত টেনেছে। এ বৃত্তের মধ্যে জন্মগ্রহণকারীদের সে তার আপন জন এবং বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের পর বলে মনে করেছে। কোন যৌক্তিক বা নৈতিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে এ বৃত্ত টানা হয়নি বরং টানা হয়েছে জন্মের ভিত্তিতে যা একটি অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার মাত্র। কোথাও এর ভিত্তি একই খান্দান, গোত্র ও গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করা এবং কোথাও একই ভৌগলিক এলাকায় কিংবা এক বিশেষ বর্ণ অথবা একটি বিশেষ ভাষাভাষী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা। তাছাড়া এসব ভিত্তির ওপর নির্ভর করে আপন ও পরের বিভেদ রেখা টানা হয়েছে। এ মানদণ্ডে যাদেরকে আপন বলে মনে করা হয়েছে পরদের তুলনায় তাদের কেবল অধিক ভালবাসা বা সহযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এ বিভেদনীতি ঘৃণা, শত্রুতা, তাচ্ছিল্য ও অবমাননা এবং জুলুম ও নির্যাতনের জঘন্যতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর সমর্থনে দর্শন রচনা করা হয়েছে। মত ও বিশ্বাস আবিষ্কার করা হয়েছে। আইন তৈরী করা হয়েছে। নৈতিক নীতিমালা রচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র এটিকে তাদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বিধান হিসেবে গ্রহণ করে বাস্তবে অনুসরণ করেছে। এর ভিত্তিতেই ইহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত সৃষ্টি বলে মনে করেছে এবং তাদের ধর্মীয় বিধি–বিধানে পর্যন্ত অইসরাঈলীদের অধিকার ও মর্যাদা ইসরাঈলীদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রেখেছে। এ ভেদনীতিই হিন্দুদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের জন্ম দিয়েছে যার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উচ্চ বর্ণের লোকদের তুলনায় সমস্ত মানুষকে নীচ ও অপবিত্র ঠাওরানো হয়েছে এবং শুদ্রদের চরম লাঞ্ছনার গভীর খাদে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কালো ও সাদার মধ্যে পার্থক্য টেনে আফ্রিকা ও আমেরিকায় কৃষ্ণাংগদের ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই বরং আজ এ শতাব্দীতেই প্রতিটি মানুষ তার নিজ চোখে দেখতে পারে। ইউরোপের মানুষ আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করে রেড ইণ্ডিয়ান জাতি গোষ্ঠীর সাথে যে আচরণ করেছে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্বল জাতিসমূহের ওপর আধিপত্য কায়েম করে তাদের সাথে যে ব্যবহার করেছে তার গভীরেও এ ধ্যান–ধারণাই কার্যকর ছিল যে, নিজের দেশ ও জাতির গণ্ডির বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের জান–মাল ও

সম্ভ্রম নষ্ট করা তাদের জন্য বৈধ। তাদেরকে লুট করা, ক্রীতদাস বানানো এবং প্রয়োজনে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অধিকার তাদের আছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের জাতিপূজা এক জাতিকে অন্যান্য জাতিসমূহের জন্য যেভাবে পশুতে পরিণত করেছে তার জঘন্যতম দৃষ্টান্ত নিকট অতীতে সংঘটিত যুদ্ধসমূহেই দেখা গিয়েছে এবং আজও দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে নাৎসী জার্মানদের গোষ্ঠী দর্শন ও নরডিক প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বিগত মহাযুদ্ধে যে ভয়াবহ ফল দেখিয়েছে তা স্মরণ রাখলে যে কোন ব্যক্তি অতি সহজেই অনুমান করতে পারবে যে, তা কত বড় এবং ধ্বংসাত্মক গোমরাহী। এ গোমরাহীর সংশোধনের জন্যই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

এ ছোট্ট আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য বর্ণনা করেছেন ঃ

এক ঃ তোমাদের সবার মূল উৎস এক। একমাত্র পুরুষ এবং একমাত্র নারী থেকে তোমাদের গোটা জাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে তোমাদের যত বংশধারা দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে তা একটি মাত্র প্রাথমিক বংশধারার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যা একজন মা ও একজন বাপ থেকে শুরু হয়েছিল। এ সৃষ্টি ধারার মধ্যে কোথাও এ বিভেদ এবং উচ্চ নীচের কোন ভিত্তি বর্তমান নেই। অথচ তোমরা এ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত আছো। একই আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা। এমন নয় যে, বিভিন্ন মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন খোদা সৃষ্টি করেছেন। একই সৃষ্টি উপকরণ দ্বারা তোমরা সৃষ্টি হয়েছো। এমন নয় যে, কিছু সংখ্যক মানুষ কোন পবিত্র বা মূল্যবান উপাদানে সৃষ্টি হয়েছে এবং অপর কিছু সংখ্যক কোন অপবিত্র বা নিকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। একই নিয়মে তোমরা জন্মলাভ করেছো। এমনও নয় যে, বিভিন্ন মানুষের জন্মলাভের নিয়ম-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া তোমরা একই পিতা-মাতার সন্তান। এমনটিও নয় যে, সৃষ্টির প্রথম দিককার মানব দম্পতির সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আলাদা আলাদা জন্মলাভ করেছে।

দুই ঃ মূল উৎসের দিক দিয়ে এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। একথা স্পষ্ট যে, সমগ্র বিশ্বে গোটা মানব সমাজের একটি মাত্র বংশধারা আদৌ হতে পারতো না। বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন খান্দান ও বংশধারার সৃষ্টি হওয়া এবং তারপর খান্দানের সমন্বয়ে গোত্র ও জাতিসমূহের পত্তন হওয়া অপরিহার্য ছিল। অনুরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর বর্ণ, দেহাকৃতি, ভাষা এবং জীবন যাপন রীতিও অবশ্যম্ভাবীরূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। একই ভূখণ্ডের বসবাসকারীরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ এবং দূর-দূরান্তের ভূখণ্ডে বসবাসকারীদের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতিগত এ পার্থক্য ও ভিন্নতার দাবী এ নয় যে, এর ভিত্তিতে উচ্চ ও নীচ, ইতর ও ভদ্র এবং শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হওয়ার ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হবে, একটি বংশধারা আরেকটি বংশধারার ওপর কৌলিণ্যের দাবী করবে, এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের লোকদের হেয় ও নীচ মনে করবে, এক জাতি অন্য জাতির ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য কায়েম করবে এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এক জাতি অন্য জাতির ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। যে কারণে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানব গোষ্ঠীসমূহকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের আকারে বিন্যস্ত

করেছিলেন তা হচ্ছে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক জানা শোনা ও সহযোগিতার জন্য এটাই ছিল স্বাভাবিক উপায়। এ পদ্ধতিতে একটি পরিবার, একটি প্রজাতি, একটি গোত্র এবং একটি জাতির লোক মিলে একটি সম্মিলিত সমাজ গড়তে এবং জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে একে অপরের সাহায্যকারী হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট প্রকৃতি যে জিনিসকে পারস্পরিক পরিচয়ের উপায় বানিয়েছিল শুধু শয়তানী মূঢ়তা ও মুর্খতা সে জিনিসকে গর্ব ও ঘৃণার উপকরণ বানিয়ে নিয়েছে এবং বিষয়টিকে অত্যাচার ও সীমালংঘনের পর্যায় পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছে।

তিন ঃ মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ যদি কিছু থেকে থাকে এবং হতে পারে তাহলে তা হচ্ছে নৈতিক মর্যাদা। জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষ সমান। কেননা, তাদের সৃষ্টিকর্তা এক, তাদের সৃষ্টির উপাদান ও সৃষ্টির নিয়ম–পদ্ধতিও এক এবং তাদের সবার বংশধারা একই পিতা–মাতা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তাছাড়া কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ দেশ, জাতি অথবা জাতি–গোষ্ঠীতে জন্মলাভ করা একটি কাকতালীয় ব্যাপার মাত্র। এতে তার ইচ্ছা, পছন্দ বা চেষ্টা–সাধনার কোন দখল নেই। এদিক দিয়ে কোন ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তির ওপর মর্যাদালাভের কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। যে মূল জিনিসের ভিত্তিতে এক ব্যক্তি অপর সব ব্যক্তিদের ওপর মর্যাদা লাভ করতে পারে তা হচ্ছে, সে অন্য সবার তুলনায় অধিক আল্লাহ ভীরু মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং নেকী ও পবিত্রতার পথ অনুগমনকারী। এরূপ ব্যক্তি যে কোন বংশ, যে কোন জাতি এবং যে কোন দেশেরই হোক না কেন সে তার ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। যার অবস্থা এর বিপরীত সর্বাবস্থাই সে একজন নিকৃষ্টতর মানুষ। সে কৃষ্ণাঙ্গ হোক বা শ্বেতাঙ্গ হোক এবং প্রাচ্যে জন্মলাভ করে থাকুক বা পাশ্চাত্যে তাতে কিছু এসে যায় না।

এ সত্য কথাগুলোই যা কুরআনের একটি ছোট্ট আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে—রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তিতে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় কা'বার তাওয়াফের পর তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বলেছিলেন ঃ

الحمد لله الذى اذهب عنكم عيبة الجاهلية وتكبرها - يا ايها الناس ، الناس رجلان ، برتقى كريم على الله ، وفاجر شقى هين على الله - الناس كلهم بنو ادم وخَلَقَ اللّٰهُ ادم من تراب -

(بيهقى فى شعب الايمان - ترمذى)

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের দোষ–ত্রুটি ও অহংকার দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! সমস্ত মানুষ দু' ভাগে বিভক্ত। এক, নেক্‌কার ও পরহেজগার—যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দুই, পাপী ও দুরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। অন্যথায় সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি।" (বায়হাকী—ফী শুআবিল ঈমান, তিরমিযী)

বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে নবী (সা) বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

يا ايها الناس ، الا ان ربكم واحد – لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى ، ان اكرمكم عند الله اتقكم – الا هل بَلَّغتُ ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال فليبلغ اشّاهد الغائب (بيهقى)

"হে লোকজন ! সাবধান ! তোমাদের আল্লাহ একজন। কোন অনারবের ওপর কোন আরবের ও কোন আরবের ওপর কোন অনারবের কোন কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের ও কোন শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। বলো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দিয়েছি? সবাই বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌছিয়ে দেয়।" (বায়হাকী)

একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

كلكم بنو ادم وادم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم او ليكونن اهون على الله من الجعلان – (بزار)

"তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। লোকজন তাদের বাপদাদার নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত হোক। তা না হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা নগণ্য কীট থেকেও নীচ বলে গণ্য হবে।" (বাযৃযার)

আর একটি হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

ان الله لا يسئلكم عن احسابكم ولا عن انسابكم يوم القيامة ان اكرمكم عند الله اتقكم – (ابن جرير)

"আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। তোমাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহভীরু সে–ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।" (ইবনে জারীর)

আরো একটি হাদীসের ভাষা হচ্ছে ঃ

ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم (مسلم ، ابن ماجه)

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ-কর্ম দেখেন।" (মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

এসব শিক্ষা কেবল কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং সে শিক্ষা অনুসারে ইসলাম ঈমানদারদের একটি বিশ্বভ্রাতৃত্ব বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিয়েছে। যেখানে বর্ণ, বংশ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার কোন ভেদাভেদ নেই, যেখানে উচ্চ নীচ, ছুত-ছাত এবং বিভেদ ও পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই, এবং যে কোন জাতি, গোষ্ঠী ও দেশেরই হোক না কেন সেখানে সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ সমান অধিকার নিয়ে শরীক হতে পারে এবং হয়েছে। ইসলামের বিরোধীদেরও একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, মানবিক সাম্য ও ঐক্যের নীতিমালাকে মুসলিম সমাজে যেভাবে সফলতার সাথে বাস্তব রূপদান করা হয়েছে বিশ্বের আর কোন ধর্ম ও আদর্শে কখনো তার কোন নজির পরিলক্ষিত হয়নি। একমাত্র ইসলাম সেই আদর্শ যা বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলে ও আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীকে মিলিয়ে একটি জাতি বানিয়ে দিয়েছে।

এ পর্যায়ে একটি ভ্রান্ত ধারণা দূর করাও অত্যন্ত জরুরী। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে ইসলামী আইন 'কুফু' বা 'সমবংশ' হওয়ার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করে, কিছু লোক তার অর্থ গ্রহণ করে এই যে, কিছুসংখ্যক জ্ঞাতি গোষ্ঠী আছে কুলীন ও অভিজাত এবং কিছু সংখ্যক ইতর ও নীচ। তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক আপত্তিজনক। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। ইসলামী আইন অনুসারে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষের প্রত্যেক মুসলমান নারীর সাথে বিয়ে হতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবনের সফলতা স্বামী-স্ত্রীর অভ্যাস, আচার-আচরণ, জীবন যাপন পদ্ধতি, পারিবারিক ও বংশগত ঐতিহ্য এবং আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার ওপর নির্ভর করে যাতে তারা পরস্পরের সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। 'কুফু' বা সমবংশ হওয়ার মূল লক্ষ্য এটাই। যেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এদিক দিয়ে অনেক বেশী দূরত্ব হবে সেখানে জীবনব্যাপী বিস্তৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক বনিবনার আশা কমই করা যায়। তাই ইসলামী আইন এ রকম দাম্পত্য বন্ধনকে পছন্দ করে না। এখানে আশরাফ ও আতরাফের কোন প্রশ্ন নেই। বরং উভয়ের অবস্থার মধ্যে যদি স্পষ্ট পার্থক্য ও ভিন্নতা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

২৯. অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কে গুণাবলীর দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ আর কে নীচু মর্যাদার মানুষ তা আল্লাহই ভাল জানেন। মানুষ নিজেরা নিজেদের উচ্চ নীচের যে মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। হতে পারে দুনিয়াতে যাকে অনেক উচ্চ মর্যাদার মানুষ মনে করা হতো আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালায় সে অতি নীচুস্তরের মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং যাকে এখানে অতি নগণ্য মনে করা হয়েছে সেখানে সে অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আসল গুরুত্ব দুনিয়ার সন্মান ও লাঞ্ছনার নয়, বরং কেউ আল্লাহর কাছে যে সম্মান ও লাঞ্ছনা লাভ করবে তার। তাই যেসব গুণাবলী আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভের উপযুক্ত বানাতে পারে নিজের মধ্যে সেসব বাস্তব গুণাবলী সৃষ্টির জন্য মানুষের সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত হওয়া উচিত।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

এ বেদুইনরা বলে, "আমরা ঈমান এনেছি"[৩০] তাদের বলে দাও তোমরা ঈমান আন নাই। বরং বল, আমরা অনুগত হয়েছি।[৩১] ঈমান এখনো তোমাদের মনে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের পথ অনুসরণ করো তাহলে তিনি তোমাদের কার্যাবলীর পুরস্কার দানে কোন কার্পণ্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। প্রকৃত ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে পরে আর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। তারপর প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।

৩০. এর অর্থ সমস্ত বেদুঈন নয়। বরং এখানে কতিপয় বিশেষ বেদুঈন গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হচ্ছে যারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে এই ভেবে মুসলমান হয়ে যায় যে, মুসলমানদের আঘাত থেকেও নিরাপদ থাকবে এবং ইসলামী বিজয় থেকে সুবিধাও ভোগ করবে। এসব লোক প্রকৃতপক্ষে সরল মনে ঈমান গ্রহণ করেছিল না। শুধু ঈমানের মৌখিক অঙ্গীকার করে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজেদেরকে মুসলমানদের অন্তরভুক্ত করে নিয়েছিল। তাদের এ গোপন মানসিক অবস্থা তখনই ফাঁস হয়ে যেতো যখন তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে নানা রকমের দাবী-দাওয়া পেশ করতো এবং এমনভাবে নিজেদের অধিকার ফলাতো যে, ইসলাম গ্রহণ করে তারা যেন রসূলের (সা) মস্তবড় উপকার সাধন করেছে। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে কয়েকটি গোষ্ঠীর এ আচরণের উল্লেখ আছে। যেমন ঃ মুযাইনা, জুহাইনা, আসলাম, আশজা', গিফার ইত্যাদি গোত্রসমূহ। বিশেষ করে বনী আসাদ ইবনে খুযায়মা গোত্র সম্পর্কে ইবনে আব্বাস এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের বর্ণনা করেছেন যে, একবার দুর্ভিক্ষের সময় তারা মদীনায় এসে আর্থিক সাহায্য দাবী করে বারবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে লাগলো ঃ আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মুসলমান হয়েছি, অমুক ও অমুক গোত্র যেমন যুদ্ধ করেছে আমরা আপনার বিরুদ্ধে তেমন যুদ্ধ করিনি। একথা বলার পেছনে তাদের পরিষ্কার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা এবং ইসলাম গ্রহণ করা যেন তাদের একটি বড় দান। তাই রসূল ও ঈমানদারদের কাছে এর বিনিময় তাদের

পাওয়া উচিত। মদীনার আশেপাশের বেদুঈন গোষ্ঠীসমূহের এ আচরণ ও কর্মনীতি সম্পর্কে এ আয়াতগুলোতে সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সমালোচনা ও পর্যালোচনার সাথে সূরা তাওবার ৯০ থেকে ১১০ আয়াত এবং সূরা ফাত্‌হের ১১ থেকে ১৭ আয়াত মিলিয়ে পড়লে এ বিষয়টি আরো ভালভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

৩১. মূল আয়াতে قُولُوا أَسْلَمْنَا কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে, "বলো, আমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছি" এ আয়াতাংশ থেকে কোন কোন লোক এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, কুরআন মজীদের ভাষায় 'মু'মিন' ও 'মুসলিম' দু'টি বিপরীত অর্থ জ্ঞাপক পরিভাষা। মু'মিন সে ব্যক্তি যে সরল মনে ঈমান আনয়ন করেছে এবং মুসলিম সে ব্যক্তি যে ঈমান ছাড়াই বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। এখানে অবশ্য ঈমান শব্দটি আন্তরিক বিশ্বাস এবং ইসলাম কেবল বাহ্যিক আনুগত্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এমনটি বুঝে নেয়া ঠিক নয় যে, এ দু'টি শব্দ কুরআন মজীদের দু'টি স্থায়ী ও বিপরীত অর্থজ্ঞাপক পরিভাষা। কুরআনের যেসব আয়াতে ইসলাম ও মুসলিম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তা বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান নাযিল করেছেন কুরআনের পরিভাষায় তার নাম ইসলাম। ঈমান ও আনুগত্য উভয়টি এর অন্তরভুক্ত। আর মুসলিম সে ব্যক্তি যে সরল মনে মেনে নেয় এবং কার্যত আনুগত্য করে। প্রমাণ স্বরূপ নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলো দেখুন ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ (ال عمران : ١٩)

"নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর মনোনীত দীন 'ইসলাম'।" (আলে ইমরান, ১৯)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ (ال عمران : ٨٥)

"যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা চায় তার সেই জীবন ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না।" (আলে ইমরান, ৮৫)

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا (المائدة : ٣)

"আমি তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছি।"

(আল মায়েদা, ৩)

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ (الانعام : ١٢٥)

"আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করতে চান তার হৃদয় মনকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।" (আল আনআম, ১২৫)

قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ (الانعام : ١٤)

"হে নবী ! বলে দাও, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে আমি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হই।" (আল আনআম, ১৪)

فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا (ال عمران : ٢٠)

"এরপর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে হিদায়াত প্রাপ্ত হলো।" (আলে ইমরান, ২০)

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا (المائدة : ٤٤)

"সমস্ত নবী—যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাওরাত অনুসারে ফায়সালা করতেন।" (আল মায়েদা, ৪৪)

এসব আয়াতে এবং এ ধরনের আরো বহু আয়াতে ইসলাম গ্রহণের অর্থ কি ঈমানবিহীন আনুগত্য করা? একইভাবে 'মুসলিম' শব্দটি যে অর্থে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্য নমুনা হিসেবে নিম্ন বর্ণিত আয়াতসমূহ দেখুন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (ال عمران : ١٠٢)

"হে ঈমান গ্রহণকারীগণ ! আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করো। আর মুসলিম হওয়ার আগেই যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে।" (আলে ইমরান, ১০২)

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا (الحج : ٧٨)

"তিনি এর পূর্বেও তোমাদের নামকরণ করেছিলেন মুসলিম তাছাড়া এ কিতাবেও।" (আল হাজ্ব, ৭৮)

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمَ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا (ال عمران : ٦٧)

"ইবরাহীম ইহুদী বা খৃষ্টান কোনটাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম।" (আলে ইমরান, ৬৭)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ (البقرة :١٢٨)

"(কা'বা ঘর নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের দোয়া) হে আমাদের রব, আমাদের দু'জনকেই তোমার অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশ থেকে এমন একটি উম্মত সৃষ্টি করো যারা তোমার অনুগত হবে।" (আল বাকারা, ১২৮)।

يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (البقرة : ١٣٢)

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

হে নবী ! ঈমানের এ দাবীদারদের বলো, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দীনের কথা অবগত করাচ্ছো? আল্লাহ তো আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস ভালভাবে অবহিত। এসব লোক তোমাকে বুঝাতে চায় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার উপকার করেছে। তাদের বলো, ইসলাম গ্রহণ করে আমার উপকার করেছো একথা মনে করো না। বরং যদি তোমরা নিজেদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের উপকার করে চলেছেন। কারণ তিনি তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আসমান ও যমীনের প্রতিটি গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জানেন। তোমরা যা কিছু করছো তা সবই তিনি দেখছেন।

[নিজের সন্তানদেরকে হযরত ইয়াকূবের (আ) অসীয়ত] হে আমার সন্তানেরা, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এ জীবন বিধানকেই মনোনীত করেছেন। অতএব, মুসলিম হওয়ার আগে যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে।" (আল বাকারা), ১৩২)।

এসব আয়াত পাঠ করে এমন ধারণা কে করতে পারে যে, এতে উল্লেখিত মুসলিম শব্দের দ্বারা এমন লোককে বুঝানো হয়েছে যে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করলেও আন্তরিকভাবে তা মানে না? সুতরাং কুরআনের পরিভাষা অনুসারে ইসলাম অর্থ ঈমানহীন আনুগত্য এবং কুরআনের ভাষায় কেবল বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণকারীকেই মুসলিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এরূপ দাবী করাও চরম ভুল। অনুরূপ এ দাবী করাও ভুল যে, কুরআন মজীদে উল্লেখিত ঈমান ও মু'মিন শব্দ দু'টি অবশ্যই সরল মনে মেনে নেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব শব্দ নিসন্দেহে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এমন অনেক স্থানও আছে যেখানে এ শব্দ ঈমানের বাহ্যিক স্বীকৃতি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছে। يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা সত্যিকার মু'মিন, না দুর্বল ঈমানের অধিকারী না মুনাফিক তা বিচার করা হয়নি। এর বহুসংখ্যক

উদাহরণের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটির জন্য দেখুন, আলে ইমরান, আয়াত ১৫৬; আন নিসা, ১৩৬; আল মায়েদা, ৫৪; আল আনফাল, ২০ থেকে ২৭; আত তাওবা, ৩৮; আল হাদীদ, ২৮; আস্‌–সফ, ২০।